শুকতারা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অষ্টাত্রিংশৎ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ • ১৩৯২

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি : সুজিৎ কুণ্ডু

স্ক্যান : শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট : হরিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শেখা আর খেলা

আজ তোমরা খেলনা গাড়ী তৈরী করা শিখবে। এই খেলনা তৈরী করতে প্রয়োজন হয় — একটি খালি উলের গুটির রিল, ধারালো ছুরি, পিন, হাতুড়ি, এক খন্ড মোমবাতি, উলের কাটা, দিয়াশলাই কাঠি, শক্ত ইলাস্টিক ও পেনসিল

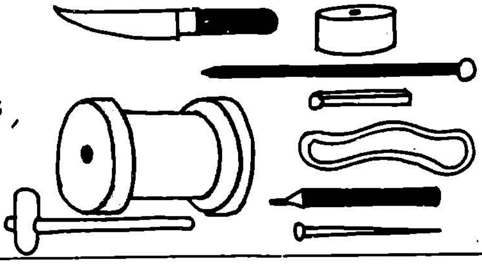

বাঁটুল দি গ্রেট

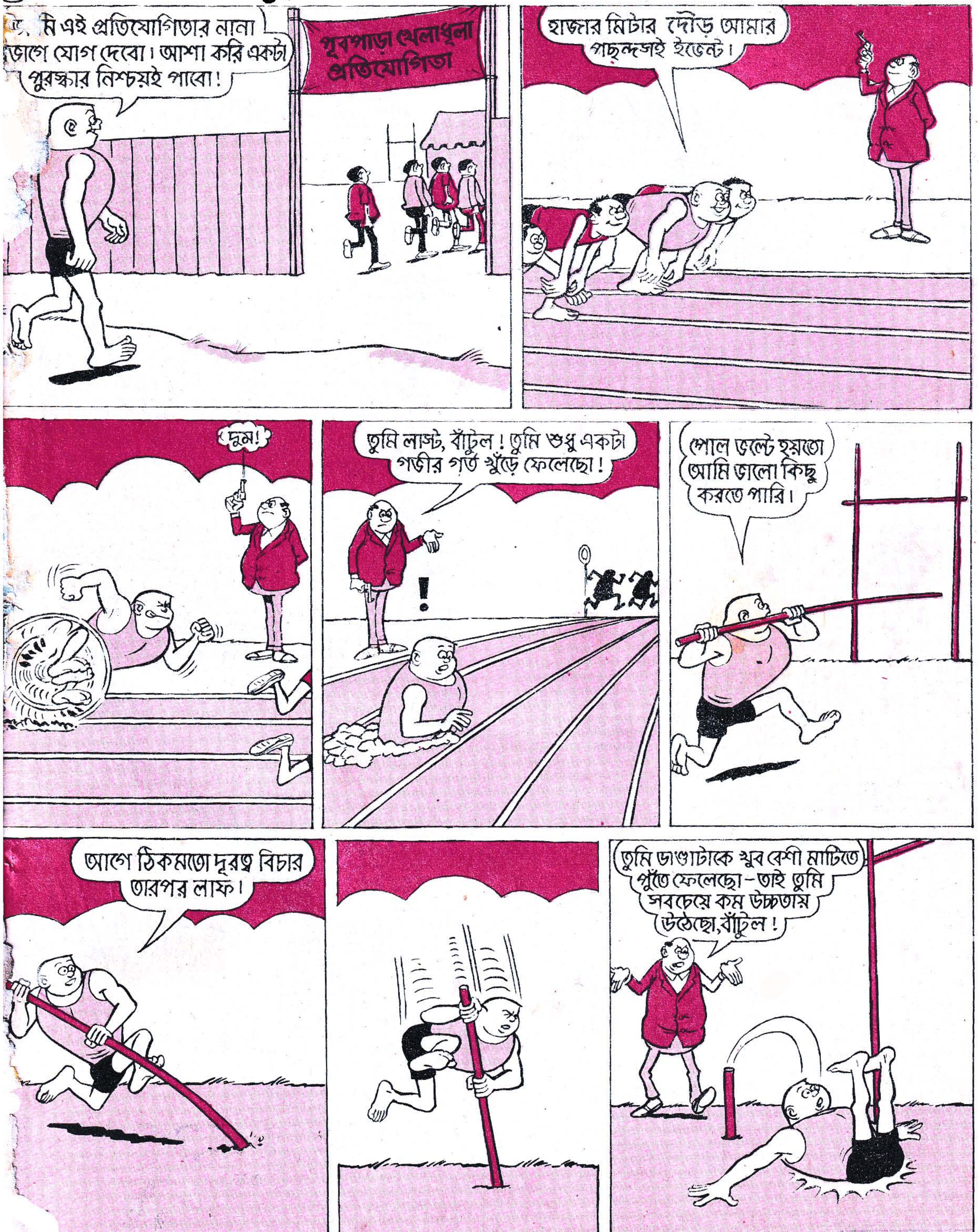

মি এই প্রতিযোগিতার নানা ভাগে যোগ দেবো। আশা করি একটা পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবো!
পূবপাড়া খেলাধূলা প্রতিযোগিতা
হাজার মিটার দৌড় আমার পছন্দসই ইভেন্ট।
দুম!
তুমি লাস্ট, বাঁটুল! তুমি শুধু একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে ফেলেছো!
!
পোল ভল্টে হয়তো আমি ভালো কিছু করতে পারি।
আগে ঠিকমতো দূরত্ব বিচার তারপর লাফ।
তুমি ডাণ্ডাটাকে খুব বেশী মাটিতে পুঁতে ফেলেছো—তাই তুমি সবচেয়ে কম উচ্চতায় উঠেছো, বাঁটুল!

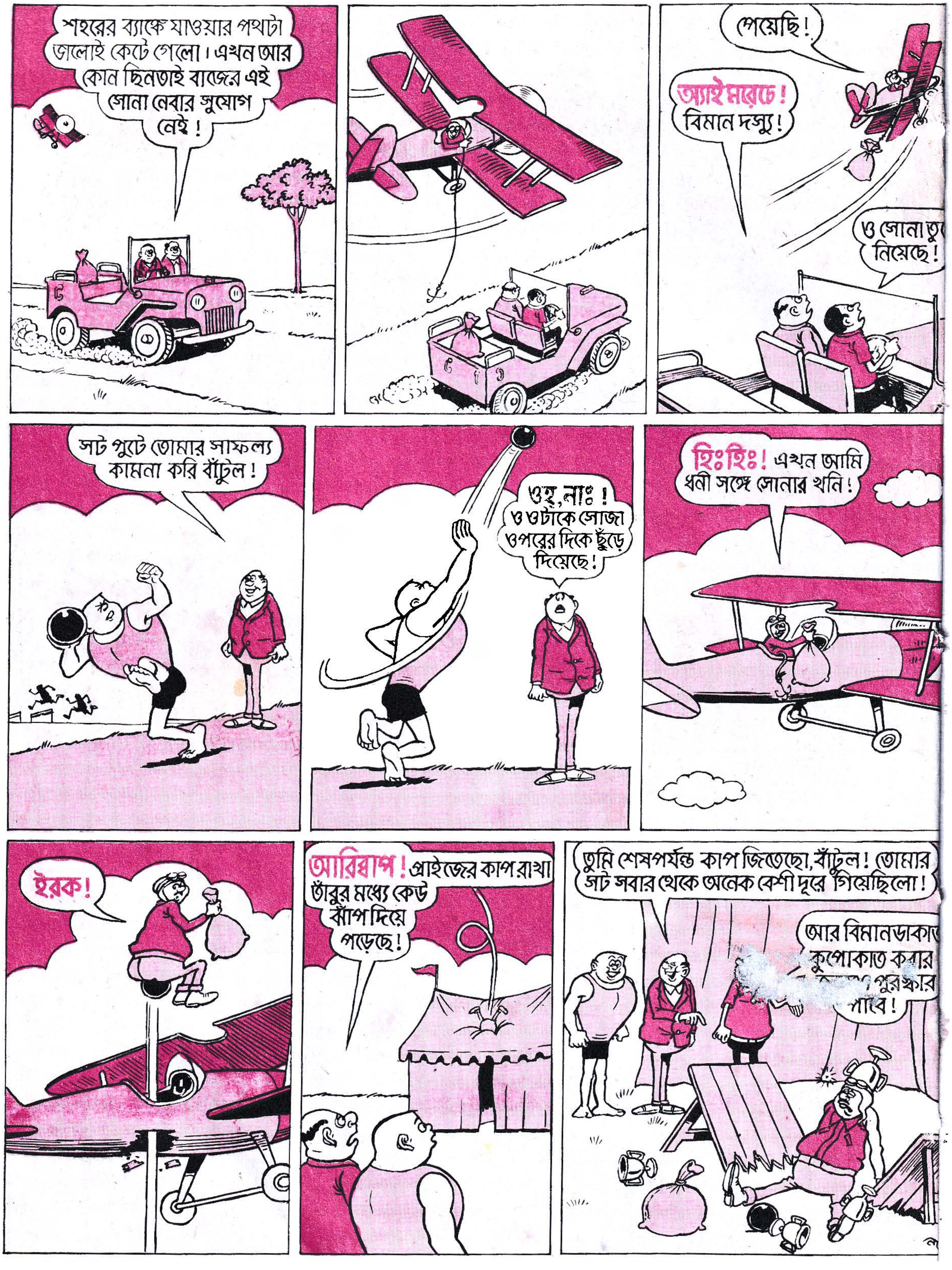
শহরের ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথটা ভালোই কেটে গেলো। এখন আর কোন ছিনতাই বাজের এই সোনা নেবার সুযোগ নেই!
পেয়েছি!
অ্যাই মরেছে! বিমান দস্যু!
ও সোনা তু
নিয়েছে!
সট পুটে তোমার সাফল্য কামনা করি বাঁটুল!
ওহ্, নাঃ! ও ওটাকে সোজা ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে!
হিঃ হিঃ! এখন আমি ধনী সঙ্গে সোনার খনি!
ইরক!
আরিব্বাপ! প্রাইজের কাপ রাখা তাঁবুর মধ্যে কেউ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে!
তুমি শেষপর্যন্ত কাপ জিতেছো, বাঁটুল! তোমার সট সবার থেকে অনেক বেশী দূরে গিয়েছিলো!
আর বিমানডাকাত
কুপোকাত করার
পুরস্কার
পাবে!

শুকতারা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২

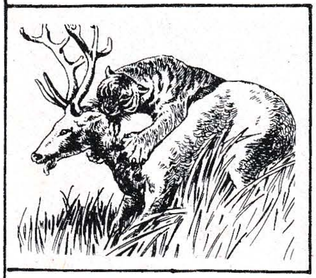

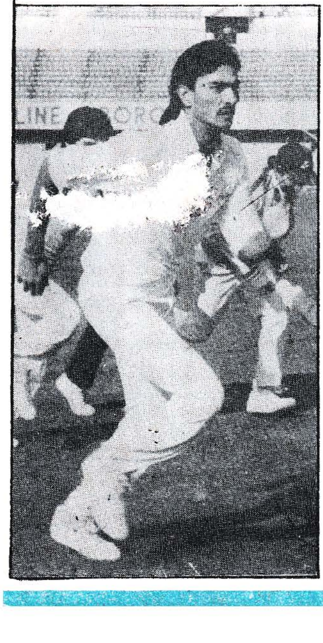

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 439/1 (2) T. B. C. (Dated 25th January 1982. 2a-2t/81)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
১। অজানা দ্বীপের বিভীষিকা (ছবিতে গল্প)	নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদ
২। বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন ছবিতে গল্প)	নারায়ণ দেবনাথ	২৪১
৩। আজব বিয়ে (কবিতা)	কল্যাণ লাহিড়ী	২৪৫
৪। রামধনুর সন্ধানে (রঙিন ছবিতে গল্প)	ময়ূখ চৌধুরী	২৪৬
৫। লেখারাম সেকেন্দ্রাবাদী (অগ্নিযুগের সৈনিক)	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	২৪৮
৬। দূরে যেতে হবে য়ে (মণিমুক্তা)	জ্যোতিভূষণ চাকী	২৫৩
৭। লালুর কৃতজ্ঞতা (গল্প)	নিতাইপদ মন্ডল	২৫৪
৮। পান্ডব গোয়েন্দা (গোয়েন্দা গল্প)	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	২৫৮
৯। বাঘ, হায়না ও শেয়াল (রূপকথা)	দিব্যজ্যোতি মজুমদার	২৬৬
১০। গুপ্তধনের সন্ধানে (ছবিতে গল্প)	হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৬৮
১১। ট্যান্টর ও টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)	সব্যসাচী	২৭০
১২। খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৫
১৩। ট্রাপিজের খেলা (ছবিতে মজার খেলা)		২৮৭
১৪। অলৌকিক (সত্য ঘটনা)	নন্দলাল ভট্টাচার্য	২৮৮
১৫। প্রথম শিকার (শিকার কাহিনী)	সুভাষ চৌধুরী	২৯১
১৬। ম্যাজিসিয়ান (ভূতের গল্প)	চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ	২৯৬
১৭। জল জংগলের দেশে (সুন্দরবনের গল্প)	শচীন দাশ	৩০২
১৮। পন্ডিত কাফি খাঁ (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা)	কালোবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৫
১৯। মহাপন্ডিত বিশ্বনাথ (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা)	নমিতা বসাক	৩০৬
২০। ঈশ্বরমণি কুন্ডু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)		৩০৭
২১। হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে মজার গল্প)	নারায়ণ দেবনাথ	৩০৮
২২। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)		৩১০
২৩। ছবির মজা (কার্টুন)	অমল	৩১২
২৪। দাদুমণির চিঠি		৩১৩
২৫। তোমাদের পাতা		৩১৪
২৬। সাহেব বাংলোর ভূত (ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস)	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৬

বি. সি. মজুমদার কর্তক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

গ্রাহক চাঁদা—বার্ষিক—সডাক ৪২ টাকা, ষান্মাসিক—২১ টাকা।

মূল্য—টাঃ ৩·৫০

যেদিন আমার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো!
"মা, অনিলের দাঁতে পোকায় বাসা করেছে!"
"মানে দাঁত ক্ষয়ে গিয়ে গর্ত হয়েছে, সোনা!"
"হ্যাঁ মা, দাঁতে গর্ত! আমি ওকে আমার দাঁত দেখালাম... আমার "স্বাদওয়ালা, ফেনাওয়ালা" টুথপেস্টের কথা বললাম..."
"ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড, সোনা!"
"ও হ্যাঁ! বললাম তুমি বলেছ ভালো, তাই আমি ওটা ব্যবহার করি! আমারও ভালো লাগে!"
"সত্যিই ভালো! মাড়ি মজবুত করে, দাঁতের আয়ু বাড়িয়ে দেয়..."
"হ্যাঁ মা! মা, একটু চকলেট কেক খাই? পরে দাঁত ব্রাশ করে ফেলবো! সত্যি মা..."
ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড
স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট
যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে!
REPLACE CAP
FOR THE GUMS
Forhan's
with active FLUORIDE to check tooth decay

331F244 BEN

শুকতারা

৩৮শ বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২/মে, ১৯৮৫

আজব বিয়ে

কল্যাণ লাহিড়ী

শ্যামলা গাঁয়ের ক্ষ্যান্তপিসির
সেজমেয়ের বিয়ে
আসছে সবাই পিসির বাড়ি
হরেক জিনিস নিয়ে।

সকাল থেকেই ভিয়েন ঘরে
সাজ সাজ রব,
মাংস পোলাও রান্না হবে
সঙ্গে মাছের চপ

সন্ধ্যা হতেই পিসির মেয়ে
ঢুকল সাজের ঘরে
সাজ হলো তার ক্ষান্ত, রাতে
আসল যখন বরে।

গভীর রাতে বরযাত্রী
এল মটর চেপে,
বাজনাদারের তুমুল রবে
উঠল পাড়া কেঁপে।

বর আসতেই ক্ষ্যান্তপিসি
চেঁচিয়ে ওঠেন জোরে
এখন কেন বর এসেছে ?
লগ্ন তো সেই ভোরে!

ভোরের বেলা হলো শুরু
পিসির মেয়ের বিয়ে
উলুধ্বনি করতে এল
পাড়ার মায়ে-ঝিয়ে।

বরকে দেখে হেসে বলে
পাড়ার ছেলে বুড়ো,
বরের বেশে আছে ও তো
মুকুজ্জেদের খুড়ো!

ছবিঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

হে মানব! আমি তোমার স্বর্ণমুদ্রাগুলি চুরি করেছিলাম বলেই বৈতরণীর মাঝির কবল থেকে তুমি নিষ্কৃতি পেয়েছ। তোমার কাছে একটি কানাকড়ি থাকলেও মৃত্যুপুরীতে তোমায় যেতে হ'ত। এস, এই দ্বীপে থাকো; এখানে তুমি আমাদের সঙ্গে সুখে বাস করতে পারবে··
দূরবর্তী ঐ জাহাজ মৃত্যুপুরীর মতো ভয়াবহ — ঐ জাহাজে উঠলে তোমাকে আমি আর সাহায্য করতে পারব না।
হে ছাগ-মানুষ! আমি রামধনুর সন্ধান চাই, সেইজন্য প্রাণ-বিপন্ন করতে আমার আপত্তি নেই।
অশনির মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ে ডুবে গেল অশনির ক্ষুদ্র নৌকা···
এমন বিচিত্র গঠনের জাহাজ কখনও দেখি নি!
অতিকষ্টে জাহাজে উঠল অশনি···
দাঁড়ী নেই, মাঝি নেই — জাহাজ চলছে!···এই জাহাজ যেন জীবন্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন!
জাহাজকে ঘিরে রয়েছে রহস্যময় কুয়াশার আবরণ!··· চারদিকে দুরন্ত ঝড়, কিন্তু জাহাজের পাল স্থির, অনড়! ··· নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হ'ল অশনি, কিন্তু অদৃশ্য প্রাচীরে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল···
জাহাজের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে একটি প্রকাণ্ড সিন্দুকের সামনে এসে দাঁড়াল অশনি···
আমি তো মৃত্যুপথের যাত্রী, আমার আর নূতন বিপদ কী ঘটতে পারে?·· এই সিন্দুক আমি এখনই ভাঙ্গব।
সিন্দুক খুলিলে বিপদ ঘটিবে
কী আছে এখানে?
একটি কুঠার তুলে নিল অশনি···

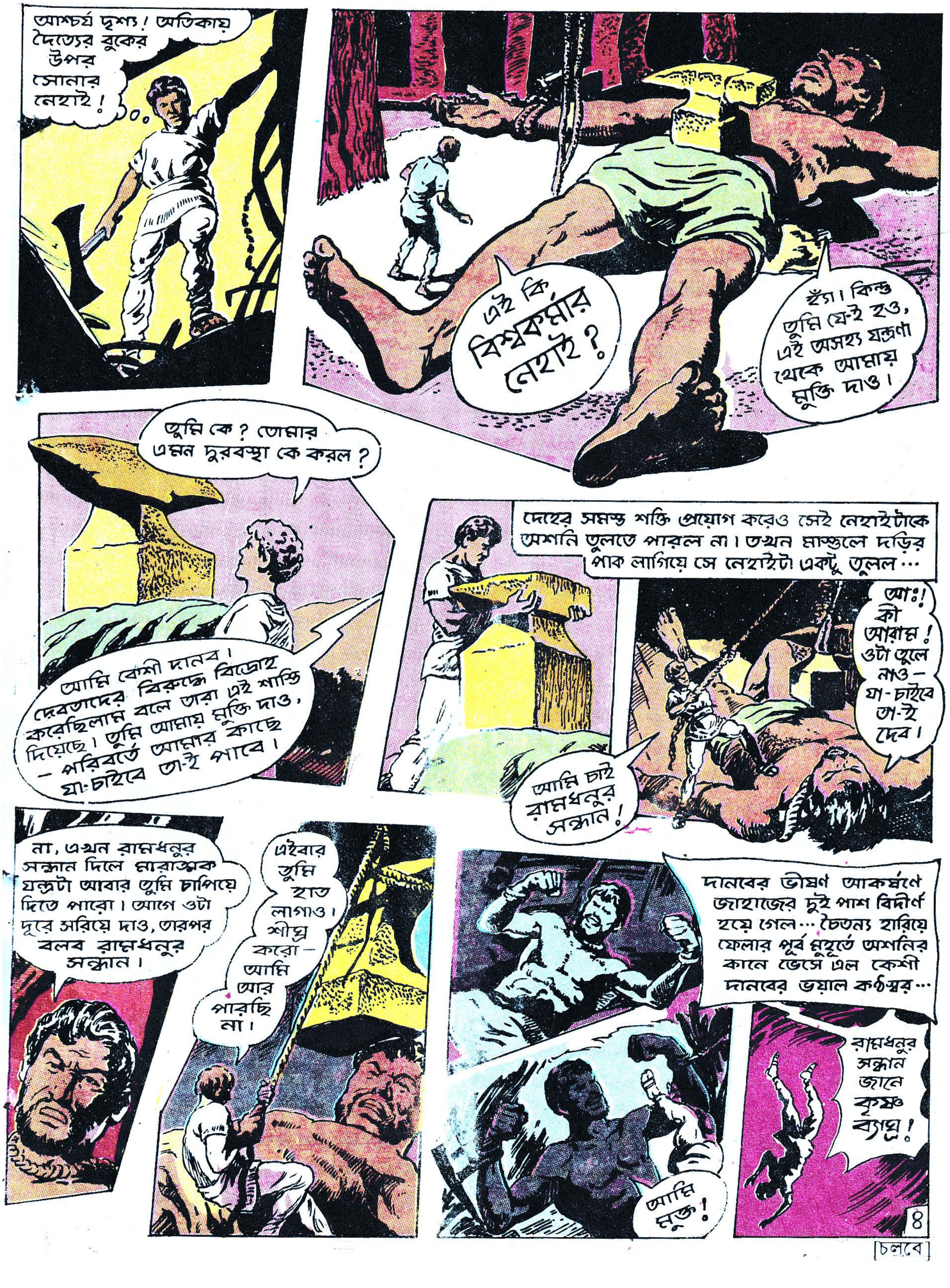
আশ্চর্য দৃশ্য! অতিকায় দৈত্যের বুকের উপর সোনার নেহাই!
এই কি, বিশ্বকর্মার নেহাই?
হ্যাঁ। কিন্তু তুমি যে-ই হও, এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্তি দাও।
তুমি কে? তোমার এমন দুরবস্থা কে করল?
আমি কেশী দানব। দেবতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম বলে তারা এই শাস্তি দিয়েছে। তুমি আমায় মুক্তি দাও, —পরিবর্তে আমার কাছে যা-চাইবে তা-ই পাবে।
দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও সেই নেহাইটাকে অশনি তুলতে পারল না। তখন মাস্তুলে দড়ির পাক লাগিয়ে সে নেহাইটা একটু তুলল…
আঃ! কী আরাম! ওটা তুলে নাও— যা-চাইবে তা-ই দেব।
আমি চাই রামধনুর সন্ধান!
না, এখন রামধনুর সন্ধান দিলে মারাত্মক যন্ত্রটা আবার তুমি চাপিয়ে দিতে পারো। আগে ওটা দূরে সরিয়ে দাও, তারপর বলব রামধনুর সন্ধান।
এইবার তুমি হাত লাগাও। শীঘ্র করো— আমি আর পারছি না।
দানবের ভীষণ আকর্ষণে জাহাজের দুই পাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল… চৈতন্য হারিয়ে ফেলার পূর্ব মুহূর্তে অশনির কানে ভেসে এল কেশী দানবের ভয়াল কণ্ঠস্বর…
আমি মুক্ত!
রামধনুর সন্ধান জানে কৃষ্ণ ব্যাঘ্র!
৪

[চলবে]

লেখারাম সেকেন্দ্রাবাদী

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

বুম-বুম-বুম—

ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। সড়কের দুই ধারেই নিবিড় বন। গুলি আসছে ডাইনের জঙ্গল থেকে। গরলা রেজিমেন্ট ভারতের দিকে মার্চ শুরু করেছে; বাইশ শো অশ্বারোহীর একটা দুর্জয় সেনাদল। খটাখট খটাখট পায়ের আওয়াজ বাইশ শো রণতুরঙ্গের। তাও ছাপিয়ে উঠল অন্তরালবর্তী শত্রু-সেনার রাইফেল-গর্জন। কর্ণেল মহবুব খাঁ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে ইশারায় কাছে ডাকলেন লেফটেনান্ট মহীন্দর কাওয়ালকে।

রেজিমেন্ট যথাপূর্ব এগিয়ে চলেছে। হতাহত একজনও হয়নি। এই আরণ্য উপজাতিগুলির ভিতর এমন লোক কমই আছে, গুলি ক'রে যে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। তবু রাইফেল কাঁধে না নিয়ে ওরা বাজার করতেও যায় না রাইফেল ওদের আভিজাত্যের চাপরাশ।

মহীন্দর কাওয়াল কাছে এসে স্যালিউট দিতেই কর্ণেল বললেন—"হেড-কোয়ার্টারে যা খবর ছিল, তাতে ত এইরকমটাই বুঝেছিলাম আমরা যে ছিন্দিন সড়কের আশেপাশে যেসব উপজাতি আছে, তারা আমাদের শত্রু নয়। সে-ক্ষেত্রে এই গুলিবাজি খুব বেখাপ্পা লাগছে আমার কাছে। ঘটনাটা কী, না-জেনে এখান থেকে চলে যাওয়া সমীচীন মনে করছি না। আমরা অবশ্য পেরিয়ে যাচ্ছি নিরাপদেই, কিন্তু কাল পরশু তরশু আরও ত ফৌজ আসবে আমাদের এই সড়ক দিয়ে। সুতরাং এখানকার আবহাওয়াটা আমাদের জানা থাকা দরকার।"

"কী করতে হবে, বলুন"—আবার স্যালিউট দিলেন মহীন্দর কাওয়াল।

কর্ণেল বললেন—"তোমার কোম্পানীটা নিয়ে তুমি ডাইনের বনটাতে ঢোকো একবার। একশো অশ্বারোহী একত্রে থাকবে তোমরা, হঠাৎ বিপন্ন হয়ে পড়ার আশংকা নিশ্চয়ই নেই তোমাদের। ঘণ্টা তিনেক বনটা ঢুঁড়বে। কারা আছে ওখানে জানবে। তাদের মতলব কী, বুঝবার চেষ্টা করবে। তারপর আবার সড়কে উঠে পিছু নেবে রেজিমেন্টের। আমাদের আজকার ছাউনি রাঙ্গু, জানো ত?"

তৃতীয় বার স্যালিউট দিয়ে মহীন্দর কাওয়াল নিজের কোম্পানীর একশো সওয়ারকে আলাদা করে নেওয়ার জন্য পেছু-পানে ছুটলেন। সে-কোম্পানীটা গোড়া থেকে পিছনেই আছে বাহিনীর।

রেজিমেন্ট একটা মোড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল পশ্চিম পানে। এদিকে ভরদুপুরে মহীন্দর কাওয়ালের একশো সওয়ার সড়ক থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকল গুপ্তশত্রুর সন্ধানে।

সেই দলে আছে হাবিলদার লেখারাম, মোকাম যার বুলন্দশহর জেলার অখ্যাত গাঁও সেকেন্দ্রাবাদ। লাঙ্গা তরোয়ালের মত দীপ্তিমান দেহ, দুটো চোখ যেন বিদ্যুতের মত ঝলক দিচ্ছে অবিরত। বংশানুক্রমে ওরা শস্ত্রজীবী, ঐ লেখারামদের পরিবার। আগে চাকরি করত কোন-না-কোন শিখ সর্দারের মিছিলে, তারপর, চিলিয়ানওয়ালার পর থেকে আংরেজরাজের সেবাতেই ওরা নিয়োজিত রেখেছিল দেহ মন ও কৃপাণকে। লেখারামও

পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল, আঠারো বছর বয়সেই নোকরি নিয়েছিল দরিয়াপারের সাদা বাদশার পল্টনে।

তারপর ভারত ছেড়ে বর্মায় এল সেই পল্টন, জাপানী হামলা রুখতে হবে বর্মা সীমান্তে। এল জাপানী, লড়াই যাকে বলে, তা কিছুই হ'ল না। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু এল উড়তে উড়তে, বোমায় বোমায় ছারখার করে দিল বর্মা মুলুক। খাপ থেকে তরোয়াল খুলবার ফুরসুত পেলো না লেখারাম। একটা বোমা কোথায় যেন ফাটল, তা থেকে একটা টুকরো এসে বিঁধে গেল তার কাঁধে। সে ধরা পড়ে গেল আরও অনেক অনেক সিপাহীর সংগে। সিংগাপুর চালান হয়ে গেল তারা।

কাঁধের ঘা ভাল করে শুকোবার আগেই তাদের গোটা দলটা শপথ করে ত্যাগ করল বিদেশী আংরেজের আনুগত্য। "দিল্লী চলো" উদাত্ত আহ্বান তারা শুনতে পেয়েছে এক জ্যোতির্ময় রণদেবতার মুখ থেকে, সে দেবতার নাম সুভাষ বোস, আজাদ ফৌজের সেনাপতি থেকে সেপাই পর্যন্ত জনে জনে যাঁকে নেতাজী বলে জানে ও মানে। লেখারাম আর তার সহকর্মীরা শুনল তাঁর আহ্বান, সাড়া দিতে বিলম্ব করল না তিলমাত্র। শুনল তাঁর প্রতিশ্রুতি—"তোমরা রক্ত দাও আমায়, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব।" শুনল, এবং পাল্টা প্রতিশ্রুতি তারাও দিল—"এ-দেহের রক্ত দেশমাতারই দান, তুমি যেখানে যখন বলবে, সেইখানে তদ্দণ্ডেই গলার নলী ছিঁড়ে সে-রক্ত ঢেলে দেব মায়ের পা ধুইয়ে দেবার জন্য।"

সেই থেকে লেখারাম আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক। উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, বিল্লা-পদকে লোভ নেই ওর, ছয় মাস কোন বেতন পায় নি যে, তাতেও আফশোষ নেই কিছু। "আংরেজ আগে হটুক, তন্খা আমাদের যাচ্ছে কোথায়?"—এই মনোভাব লেখারামের। তার মত অন্য লক্ষ সৈনিকেরও।

মহীন্দর কাওয়াল জংগলে ঢুকলেন—"খুব হুঁশিয়ার সবাই। বুলেটের চেয়েও মারাত্মক শত্রু আছে এ-জংগলে। ঝোপে ঝোপে ডালে ডালে সাপ। সাক্ষাৎ যম। ছুঁয়ে গেলে আর রক্ষা নাই। তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাবার চেষ্টা করো না। চোখ কান খোলা রেখে এগুবে। তরোয়াল হাতে নিয়ে এগুবে। নাগালের ভিতর সাপ দেখলেই" নিজের হাতের তরোয়াল দিয়ে সাঁ করে খানিকটা হাওয়া চিরে ফেললেন কাওয়াল—"সাপেদের দেখিয়ে দাও যে ছোবল মারতে আমরাও জানি।"

"তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাবার চেষ্টা করো না"—গোড়াতেই বলে রেখেছেন কাওয়াল। চেষ্টা করলেও তা যাবে না ছোটানো। কারণ বনস্পতিজাতীয় গাছ খুব বেশী না থাকলেও এ-জংগলে ঝোপঝাড় বড়ই বেশী। ঐ সব জায়গাতেই সাপের আড্ডা থাকে। আর এসব জায়গাতেই পা ফেলবার ফাঁক পায় না ঘোড়া। তবু, দ্রুত যেতে না পারলেও ক্রমাগত ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেই পল্টনটা। এক ঘণ্টায় দুই মাইল অন্ততঃ চলে গিয়েছে নিবিড় বনের মর্মভেদ করে। অথচ কোন দিকে শত্রুপক্ষের কোন চিহ্নই তারা দেখতে পায়নি। কোন্ দিকে গেল তারা? লুকোলো কোথায়? ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়েছিল রেজিমেণ্টের উপরে। কমপক্ষে পঁচিশটা রাইফেল এক সাথে ফায়ার হয়েছে। পঁচিশটা অন্ততঃ রাইফেল! অর্থাৎ পঁচিশটা বন্দুকধারীও। এতগুলো লোক হাওয়ায় মিশে যেতে পারে না! যেদিকেই যাক, ঝোপঝাড় দলিত মথিত হবে, ছেঁড়া পাতা ভাংগা ডাল মাটিতে লুটোবে। কিন্তু সেসব কিছুই চোখে পড়েনি এ-যাবৎ।

একজনের পিছনে আর একজন, সৈনিকদের লাইনটা এইরকমই করতে হয়েছে। তা নইলে ত ঘুরবার ফিরবারই জায়গা পাবে না কেউ। লেখারাম পড়েছে সবাইয়ের পিছনে। দৈবাৎই পড়েছে অবশ্য।

লাইনের শেষ জওয়ান, সে-লোকটার একটু মর্যাদা থাকে বিশেষ রকম। কারণ, হঠাৎ যদি দলটাকে 'এ্যাবাউট-টার্ন' করতে হয়, অর্থাৎ পিঠ যেদিকে ছিল, মুখ সেইদিকে আনতে হয়, তাহলে বর্তমানের শেষ ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াবে তখনকার প্রথম ব্যক্তি, এক দিক দিয়ে সেই হবে দলনেতা, কারণ লেফ্‌টেনাণ্ট ত তখন থাকবেন সবাইয়ের পিছনে! পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে চলে আসবেন, তেমন পথ কই? ঝোপে ঝাড়ে সবই ত আকণ্ঠ ভর্তি!

যা হোক, দলটা চলেছে এগিয়ে, লেখারাম নিজের এই সাময়িক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। এদিকে তাকাচ্ছে, ওদিকে তাকাচ্ছে, পায়ের নীচে তাকাচ্ছে, তাকাচ্ছে না শুধু উপর পানে। তা যদি তাকাত, অবাক না হয়ে তার উপায় ছিল না।

একটা সরু দড়ি ঝুলছে উপর থেকে। যে জায়গায় ঝুলছে, লেখারামের মাথা ঠিক সেই জায়গা অতিক্রম করতে বাধ্য হবে, চোখের পলক আর একবার পড়বার সংগে সংগেই।

দেখত যদি ঐ ঝুলন্ত দড়ি, এবং সেই দড়ির আগার ফাঁস, হয়ত লেখারাম সাবধান হত, কিংবা হয়ত হত না। কিন্তু দেখেইনি যখন, তখন ত সাবধান হওয়ার প্রশ্নই

চোখের পলক আর একবার পড়বার আগেই দড়ির ফাঁস তার গলায় আটকে গেল

ওঠে না!

সাবধান সে হতে পারেনি, ফলে চোখের পলক আর একবার পড়বার আগেই দড়ির ফাঁস তার গলায় আটকে গেল। হঠাৎ এমন শক্ত হয়ে এঁটে গেল যে গলা দিয়ে আর রা কাড়তে পারল না লেখারাম।

কোন রকমে নীচুপানে একবার তাকালো লেখারাম। ঐ চলে যায় তার সাথীরা। একশোটা ঘোড়া আর নিরানব্বুইটা সেপাই। লেখারামের নিজের ঘোড়াটা একবার হয়ত থমকে দাঁড়িয়েছিল, পিঠখানাকে অসম্ভব রকম হাল্কা অনুভব করে। একবার একটা প্রশ্নসূচক হ্রেষাধ্বনিও করেছিল বুঝি। তার উত্তরে প্রভুর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে অন্য ঘোড়াদের অনুসরণ করাই সংগত মনে করল।

অশ্বারোহীদের লাইন ঐ এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনান্তরালে। লেখারাম নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেল বৃহৎ বনস্পতিটার চূড়ায় পত্রপুঞ্জের ভিতরে। সেখানে একটা তেডালার সন্ধিস্থলে অপেক্ষাকৃত দরাজ একটা জায়গা, চাতালের মত। তিনটি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নীচুপানে মুখ করে। একজন দড়িতে করে টেনে তুলছে লেখারামকে, লোকটা অসুরের মত শক্তিমান। অন্য দুইজন কোন-না-কোন ডাল ধরে রেখেছে বাঁ হাত দিয়ে, ডান হাত তাদের কোমরে ঝোলানো তরোয়ালের হাতলে।

অসুরের মত লোকটা যখন লেখারামকে টেনে তুলল তেডালায় সে তখন অর্ধমৃত। দড়ির ফাঁস এঁটে বসেছে গলায়। খুব দ্রুত হস্তে তাকে যদি তুলে না ফেলত অসুর, উঠতে উঠতে অক্কা পাওয়াই নিশ্চিত ছিল তার। দস্যুরা চেয়েছিল আজাদী ফৌজের কোন একটা সিপাহীকে ধরে ফেলতে। উদ্দেশ্য, তার কাছ থেকে কর্ণেল মহবুব খাঁর সামরিক পরিকল্পনা যথাসম্ভব জেনে নেওয়া। দস্যুদের নিজেদের কোন প্রয়োজন নেই ওসব খবরে। তারা কাজ করেছে ইংরেজ মুরুব্বিদের আড়কাঠি হিসাবে।

এ-দস্যুদল এ-অঞ্চলের বাসিন্দা নয়। আজাদ হেড-কোয়ার্টার যদি খবর পেয়ে থাকেন যে ছিন্দিন সড়কের আশেপাশে শত্রুভাবাপন্ন কোন উপজাতি নেই, সে-খবরের মধ্যে গোড়ায় কিছু ভুল ছিল না। এই যে দস্যুদলটা, এদের বাসস্থান এ-অরণ্য থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তরে, ডেহুং উপত্যকায়। সম্প্রতি নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজ সরকার এদের আনুগত্য ক্রয় করেছেন, প্রধানতঃ এই জাতীয় সহযোগিতা লাভেরই প্রত্যাশায়। বন জংগলের লড়াইয়ে এসব সাহায্যের দাম কম নয়।

পুরোপুরি জ্ঞান যখন লেখারামের ফিরে এলো, তখন সে আর বৃহৎ বৃক্ষটার তেতলার তেডালায় বসে বা দাঁড়িয়ে বা শুয়ে নেই। মাটির উপরেই সে পড়ে আছে, সেই গাছটারই নীচে। নিবিড় ঝোপে-ঝাড়ে ঘেরা একটা বৃহৎ কূপ, তারই মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে পাতাল-পানে। সেই পাতাল থেকে দস্যুরা কেউ উপরে উঠছে কখনো, আবার সেই পাতাল-পানেই অন্য কেউ হয়ত নেমে যাচ্ছে পরের মুহূর্তে।

পাশেই মস্ত একখানা টিনের ঢাকনা পড়ে আছে। লেখারামের মনে হয় ঐটি দিয়েই কূপের মুখ ঢেকে রাখে এরা বৃষ্টিবাদলার সময়। সবুজ রং করা ওতে, হঠাৎ দেখলে ঘাসে-ঢাকা মাটি বলেই মনে হবে নতুন লোকের।

লেখারামের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক ইংরেজ অফিসার, বুট থেকে হ্যাট পর্যন্ত সবই তাঁর মিলিটারি। লেখারামকে চোখ মেলতে দেখে তিনি কারেস ভাষায় একজন দস্যুকে বললেন—"লোকটাকে জল খেতে দাও। মদ ত ওরা ছোঁবে না। খাইয়ে দিতে পারলে সহজেই চাংগা করে তোলা যেতো।"

এক গেলাস জল একজন সত্যিই এনে দিল। খেয়ে কতকটা সুস্হও বোধ করল লেখারাম।

সেই অসুরের মত লোকটা সাহেবকে সম্বোধন করে বলল—"তাহলে গ্যামার্সিন, শুরু কর তোমার জেরা। পল্টনটা এখনো যায়নি বন ছেড়ে। তড়িৎ ঘড়িৎ আমাদের সরে পড়া দরকার। একশো ক্যাভালরির সংগে পাঞ্জা কষার শখ আমার নেই। ওরা সব দিকেই ঘুরছে। এদিকেও নিশ্চয়ই আসতে পারে।"

গ্যামার্সিন মুখটা বাঁকালো—"তুমি আমাকে ক্যাপ্টেন বলে ত ডাকতে পার বেন-বা!"

"তুমিও আমায় বলতে পার হাইনেস! তোমার ক্যাপ্টেন পদবিটাও যেমন সত্যি, আমার রাজবংশে জন্মটাও তেমনিই সত্যি। ডেহুং এলেকায় গিয়ে কষ্ট করে খোঁজ নাও যদি, তাতে আর সন্দেহ থাকবে না তোমার।"

গ্যামার্সিন আর কথা কইল না বেন-বার সংগে। লেখারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে মোলায়েম সুরে হিন্দীতে বলতে শুরু করল—"তুমি ত আমাদের পল্টনেই ছিলে, কী বল দোস্ত?"

"তা ছিলাম"—বলল লেখারাম।

"কারে পড়ে বোসের দলে ভিড়েছ, কী বল?"

"তা ছাড়া আবার কি!"—তরোয়াল যেমন ধারালো লেখারামের, বুদ্ধিও ঠিক তেমনি। সে চটপট একটা ফন্দী এঁটে নিয়েছে। এই ক্যাপ্টেনটাকে খেলিয়ে খেলিয়ে এর কাছ থেকে মুক্তি আদায় করার একটা চেষ্টা করলে দোষ কী?

গ্যামার্সিন বলছে—"আমরা ত উদ্ধার করেছি তোমায়। আবার এক্ষুণি সাবেক পল্টনে নিয়েও নিতে পারি। বলি, মহবুব যাচ্ছে কোথায়? ও কি ইম্ফল যাবে? না, আরাকানে? না, মাঝপথেই বসে থাকবে রাস্তা পাহারা দেবার জন্য?"

চোখের কোণে একটা হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলল লেখারাম—"একটু নিরিবিলি জায়গায় এসব কথা আলোচনা করতে চাই ক্যাপ্টেন! জানি আমি অনেক কিছু। মানে, আজাদী ফৌজের সবাই সব কথা জানে। ওখানে কোন কথা কারও কাছে গোপন রাখার রেওয়াজ নেই। যাঁকে সবাই নেতাজী বলে, সেই বোসও ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়ের পক্ষপাতী নন। যা কিছু প্ল্যান তাঁর মাথায় আছে, তা হাটে বাজারে, বক্তৃতার মুখে বলে বেড়াচ্ছেন। হালফিল যা প্ল্যান তাঁর, মহবুবও যেমন জানেন তা, আমরাও তেমনিই জানি। এই যেখানে অবস্হা, সেখানে আংরেজ বাহাদুরকে হটানোর আশা পাগলামি নয়? আমায় যদি সুযোগ দেওয়া হয়, আমি পুরোনো মনিবের কাছেই ফিরে যেতে চাই।"

হঠাৎ যেন নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে বলল—"আজাদী ফৌজে গোপন কথা কিছু নেই। কিন্তু আংরেজ ফৌজে আছে। তাই আমি বলছি, নিরিবিলি জায়গায় চলুন।"

একথা শুনে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল হাইনেস বেন-বা—"নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে সাহেবের দুই চোখে দু' মুঠো ধূলো ছড়িয়ে দিয়ে দে লম্বা। হাঃ হাঃ হাঃ—হাইনেস হিন্দীও জানে।"

গ্যামার্সিন বেন-বার কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে না। একটু ভেবে বলল—"হাইনেস, তোমার ঐ কূপের মধ্যে যদি আমি নেমে যাই এই দোস্তকে নিয়ে, কেমন হয়? নিরিবিলি জায়গা সেটা নিশ্চয়। আর সেখান থেকে লম্বা দেওয়াও সম্ভব হবে না এই দোস্তের পক্ষে।"

বেন-বাও আবার কী একটু ভেবে নিল। "আমাদের বারুদঘরে বসে তোমরা কথা কইতে পার। আমরা থাকব বাইরের ঘরে। কারণ বাইরের ঘরেই আমাদের ট্রেজারি। আংরেজ ফৌজের ক্যাপ্টেনকে অবিশ্বাস করার মত গোস্তাকি আমার নেই, কিন্তু ট্রেজারিতে পাহারা না রেখে বারুদঘরে বাইরের লোককে ঢোকানোর মত

লেখারামের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক ইংরেজ অফিসার

বোকামিও আমি করব না।"

"তা তাই চল—" রাজী হয়ে গেলেন গ্যামার্সিন। যেন তেন প্রকারেণ এই বেইমান আজাদীটার পেটের কথা বার করে নেওয়া যাক ত, তার পরে বোঝাপড়া করা যাবে হাইনেস বেন-বা'র সংগে।

কূপের ভিতরে মই নামানো আছে। নীচে তিন-চার খানা ঘর। একেবারে ভিতরের ঘরটাই বারুদঘর। বারুদের বাক্স সব সাজানো রয়েছে একটার পরে একটা। বারুদঘরের আগের ঘরখানাকেই বেন-বা বলছে ট্রেজারি। অর্থাৎ অনেকগুলি কাঠের সিন্দুক আছে সে-ঘরে। হয়ত সত্যিই ধনে-রত্নে ভরা।

বারুদঘরে ঢুকল গ্যামার্সিন, লেখারামকে নিয়ে। দরোজায় আগল তুলে দিল ভিতর থেকে। আর ট্রেজারি ঘরে, শুধু হাইনেস নয়, তার দলের বেশীরভাগ লোকই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, দোরগোড়ায় আর দেয়ালের পাশে আড়ি পাতবার জন্য।

তা তারা পাতুক।

লেখারাম বলছে—"সাহেব এগিয়ে এসো খুব কাছে। ওরা আড়ি পেতেছে সব কথা শুনবার জন্য।"

গ্যামার্সিন একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল লেখারামের।

লেখারামের তরোয়ালখানা অবশ্য দস্যুরা নিয়েই নিয়েছিল। কিন্তু তার প্যান্টের ভিতরে উরুর সংগে আলগাভাবে বাঁধা ছোরাখানার অস্তিত্ব তারা টের পায়নি।

টের পেলেন এইবার ক্যাপ্টেন গ্যামার্সিন, সেই ছোরা তাঁর বুকে বিঁধে যাওয়ার পরে।

মুক্তি! বৈর নির্যাতনের স্পৃহা লেখারামের অন্তরে এমন উগ্র হয়ে উঠেছে যে নিজের মুক্তির, নিজের প্রাণ-রক্ষার প্রয়োজনও তার কাছে এখন মনে হচ্ছে তুচ্ছ।

ছোরা বিঁধল বুকে। একটা আর্তনাদ করে ক্যাপটেন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। "কী হল ? কী হল ?"—বাইরে থেকে দস্যুদের চীৎকার। কে দেবে তার উত্তর ? লেখারাম তখন সাহেবের পকেট হাতড়াতে ব্যস্ত। না, না, অর্থ সে খুঁজছে না। সে যা খুঁজছে, তা একটা ম্যাচবাক্স। সাহেব মানুষ চুরুট খায় না, তা ত আর সম্ভব নয়।

বেন-বা তখন বারুদ ঘরের দরোজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। এদিকে লেখারাম বারুদের বাক্সে ফেলে দিল জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি। মুক্তির আশা তার নেই, প্রাণেরও না। তা মরতেই যদি হয়, ডজন দুই শত্রুকে সংগে নিয়ে যমালয়ে যাওয়া মন্দ কী ?

একটা প্রলয় বিস্ফোরণ। আধমাইল জায়গা নিয়ে অরণ্যটা বসে গেল পাতালে। ভাগ্য ভাল, কাওয়াল তখন সসৈন্যে সে-এলেকার বাইরে ছিলেন। বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে ছুটে এসে তিনি দুটো দস্যুকে দেখতে পেলেন। কূপের উপরে যারা পাহারায় ছিল, তাদের মধ্যে এই দুটোই বেঁচেছে কোনমতে।

এই দুটো লোকের মুখ থেকেই কাওয়াল প্রথম শুনলেন লেখারামের বৃত্তান্ত। তাঁর দল থেকে একটা সৈনিক যে হারিয়ে গিয়েছিল এক ঘণ্টা আগেই তা তিনি এতক্ষণ জানতে পারেননি। লেখারামের ঘোড়াটা ? সেটা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল জংগলের মধ্যে।

ছবিঃ প্রসাদ রায়

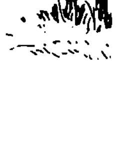

দূরে যেতে হবে যে

জ্যোতিভূষণ চাকী

থুখুড়ে বুড়ো। মাথায় কাঠের বোঝা। বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে ফিরছে বুড়ো। গ্রীষ্মের দিন। সূর্য আগুন ঢালছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে বুড়োর সারা গা বেয়ে। হাটের পথে চলেছে সে। দুচার পয়সা যা পাবে তাই দিয়ে মুখে কিছু দেবে। শুধু কি একটা মুখ? তার পথ চেয়ে বসে আছে আরও দু-একটি মুখ।

বুড়ো চলেছে। পা টলছে তার। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। কাঠের বোঝাটা মাটিতে পড়ে গেল। কোনো রকমে টাল সামলে বুড়ো একটা গাছ ধরে দাঁড়াল। নির্জন জায়গা। বুড়ো ঐ গাছের ছায়ায় বসে পড়ে। ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙে পড়ছে। বুড়ো বিড়বিড় করে বলতে থাকে, মরণ হয় না আমার! যমদূত কোথায় তুমি আমাকে এসে নিয়ে যাও এক্ষুণি।

আশ্চর্য! কে একজন তার কাছে এসে দাঁড়াল। বুড়ো খোলা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কে তুমি?

আগন্তুক বলল, আমি যমদূত। একটু আগে তুমি আমায় ডাকছিলে না?

বুড়ো আশ্চর্য সজীব কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, ডাকছিলাম। এসেছ ভালোই করেছ। বোঝাটা মাথায় তুলে দিয়ে যাও। অনেক দূরে যেতে হবে, হাটের বেলা হলো যে।

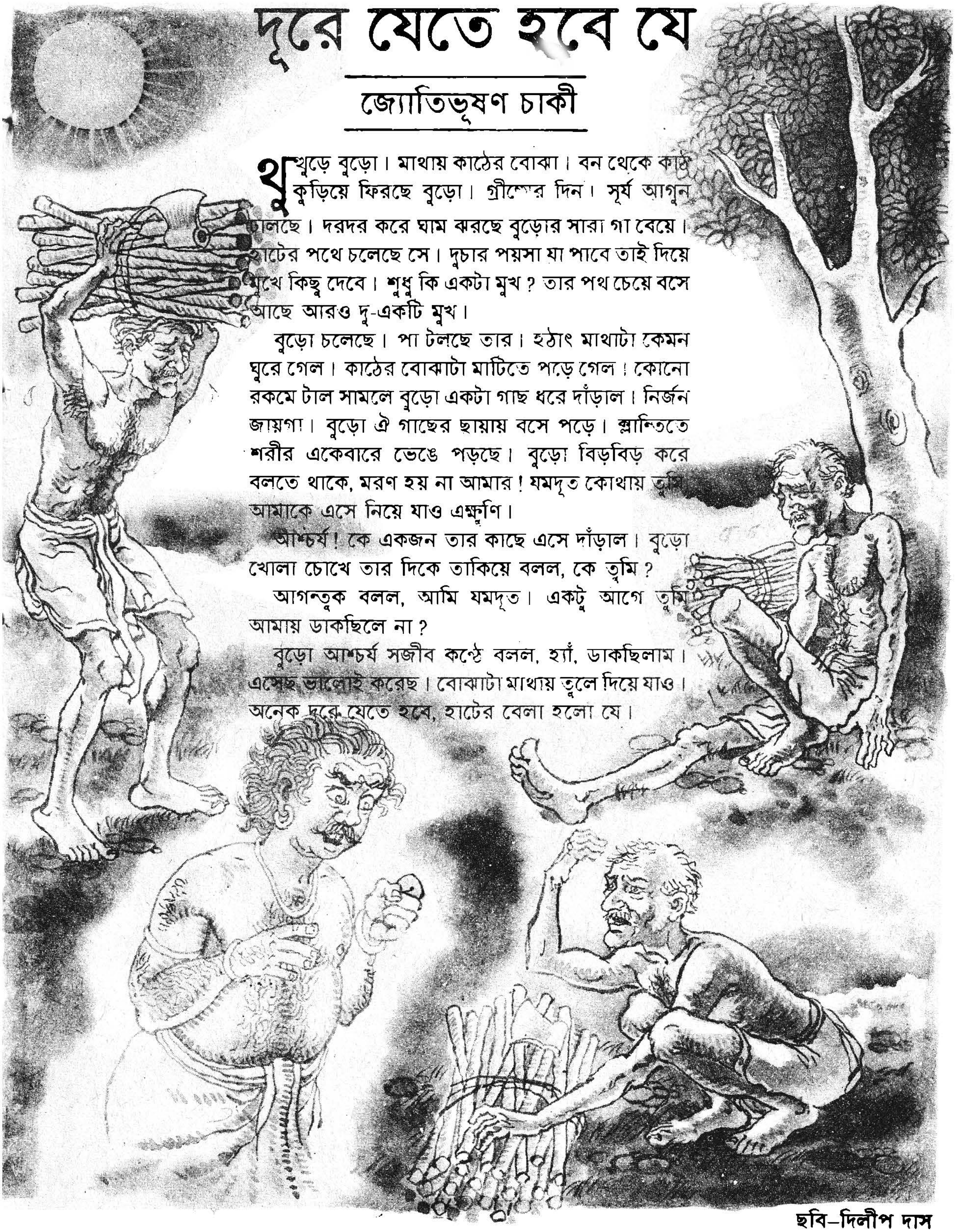

ছবি–দিলীপ দাস

লালুর কৃতজ্ঞতা

নিতাইপদ মন্ডল

সেদিন সন্ধ্যায় বাজার থেকে ফিরবার পথে পাড়ার ও প্রান্ত থেকে কানে ভেসে এলো জনের মার তর্জন-গর্জন। কাকে লক্ষ্য করে এত হম্বিতম্বি, এত দূর থেকে সঠিক কিছু বোঝা গেল না। তবে যেই হোক, তাকে যে বেশ কাহিল করে এনেছে বুঝতে একটুও বিলম্ব হলো না।

বাড়ি ফিরে দেখলাম, মা-ঠাকুমা দুজনে মিলে সাঁড়াশি-আক্রমণ চালাচ্ছে আমার ছোট ছেলে জনের উপর। জন হাত-পা নেড়ে কী বোঝাতে চাইছে, কিন্তু পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না মা-ঠাকুরমার সঙ্গে।

জিজ্ঞেস করলাম–কী হয়েছে? এত গোলমাল কিসের?

জনের মা ঝংকার দিয়ে উঠলো–জিজ্ঞাসা করো তোমার পুত্ররত্নকে।

আমাকে দেখে জন অধোবদন। তার পায়ের কাছে একটা ছোট্ট কুকুর-বাচ্চা।

বললাম–কী ওটা?

কথা বলার এমন সুযোগ হাতছাড়া হয় দেখে আমার মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন–স্কুল থেকে ফিরবার পথে কোত্থেকে একটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা জুটিয়ে এনেছে। এতো বলছি, ওটাকে ছুঁস্ নে, রাস্তায় ফেলে আয়। তা কে কার কথা শোনে? তাই নিয়েই তো এতো ঝামেলা।

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমার মা পুজো-আচ্চা, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে বড় বেশি মেতে উঠেছেন। ঐ সঙ্গে শুরু হয়েছে ছোঁয়া-ছুঁয়ি বাছ-বিচার। সব শুনে রায় দিলাম–যা হবার হয়েছে। কেষ্টর জীব। এ শীতের রাতে আর যাবে কোথায়? রাতটা থাক, কাল সকালে যা হোক ব্যবস্থা হবে। জনকে ধমকে উঠলাম–রাত হয়েছে। যা পড়তে বসগে।

জন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বিলম্ব না করে সে মুহূর্তে উধাও হলো।

–রাতে ওটা থাকবে কোথায় শুনি? মা শুধোলেন।

মায়ের তপ্ত প্রশ্নের জবাবে বললাম–কোথায় আর থাকবে, উঠোনে পড়ে থাকবে। পথের কুকুর, যেখানে সেখানে পড়ে থাকবার অভ্যেস ওর আছে। লেপ-তোশক কিছুই লাগবে না। একটা ছেঁড়া বস্তা ফেলে দিলেই ওর দিব্যি চলবে।

–যা পারিস কর। ও সব আদিখ্যেতা আমার ভাল লাগে না।

তখনকার মতো সমস্যা মিটলো।

রাত্রে জন বরাবরই আমার বিছানায় শোয়। সে বড্ড ঘুমকাতুরে। বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন কিন্তু কিছুতেই তার চোখে ঘুম এলো না। মা-ঠাকুমাব কান বাঁচিয়ে সে ফিসফিস করে আমাকে শুধালো—রাতে ওকে শেয়ালে নিয়ে যাবে না তো?

—না, শেয়ালরা অত বোকা নয়। ওকে কষ্ট করে ধরে নিয়ে যাওয়ার খরচা পোষাবে না।

জবাবটা জনের মনঃপূত হলো না। বাচ্চাটা যত কুঁই কুঁই করে, জন তত অস্থির হয়ে ওঠে। থাকতে না পেরে অবশেষে বললে—আচ্ছা বাবা, এক কাজ করলে হয় না?

—কী কাজ?

—মা-ঠাকুমা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে এনে আমাদের পায়ের কাছে বারান্দায় রাখলে কেমন হয়?

—ভালোই হয়। তবে তোর মা-ঠাকুমা জানতে পারলে মহা অনর্থ হবে। ও সব চিন্তা ছেড়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

জন চুপ করে রইলো। আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে দেখি, কুকুর-বাচ্চাটা আমারই বিছানার পাশে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বুঝলাম, এ জনের কাজ। যা হোক, ওটাকে বারান্দা থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেলাম। মাঠে ধান কাটার কাজ চলছিল। সারাদিন তাই নিয়েই ব্যস্ত রইলাম।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি, জন সেই লোম-ওঠা হাড় জিরজিরে লাল কুকুর বাচ্চাটাকে নিয়ে উঠোনের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। বললাম—ওটাকে রাস্তায় ফেলে আসতে বলেছিলাম, আসিস নি?

জন জবাব দিল—স্কুলে যাওয়ার সময় ওটাকে খুঁজে পাই নি।

ভাবলাম, তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানানো হবে। কিন্তু কিছুই হলো না দেখে মনে মনে যথেষ্ট আশ্চর্য হলেও মুখে কিছু বললাম না। এই খুঁজে না পাওয়ার মধ্যে জনের যে কিছু কারসাজি আছে, বুঝতে আমার একটুও বিলম্ব হলো না। চালাকি করে সে যে মা-ঠাকুমাকে স্বপক্ষে এনেছে, এজন্য খুশিই হলাম।

সেই থেকে লালু রয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। গায়ের রঙ লাল বলে জন কুকুরটার নাম রাখলো লালু। জনের সেবা-যত্নে লালু দিনে দিনে বেশ নাদুস-নুদুস হয়ে উঠলো। গায়ে লোম গজালো, চেকনাই ফিরলো।

লালুও কিন্তু বুঝে নিয়েছিল যে মা-ঠাকুমাকে সন্তুষ্ট রেখেই তাকে চলতে হবে। তাই ধান, লংকা, বড়ি, আচার শুকানোর জন্য রোদে দিলে সে ধৈর্য ধরে বসে বসে পাহারা দিত। কাক-চড়াই-শালিখ এদের ঘেঁষতে দিতো না। অপরের মুরগী ছাগল বাড়িতে এলে "ভেউ-ভেউ" ডাকতে ডাকতে তাড়িয়ে বাড়িছাড়া করতো। অল্প দিনের মধ্যে লালু সকলের প্রিয়-পাত্র হয়ে উঠলো। এমন কি চিতাবাঘের মত ডোরাকাটা পোষা হুলো বেড়ালটার সংগেও বেশ ভাব জমিয়ে নিল।

তবে তার প্রভু জনের মত সেও ছিল বড্ড ঘুমকাতুরে। রাতে খাওয়ার পর তার ডাকাডাকি বেশি শোনা যেত না। আরামদায়ক জায়গা বেছে নিয়ে সে অকাতরে নিদ্রা যেত। এজন্য তাকে মাঝে মাঝে কম দুর্ভোগ ভুগতে হতো না। সেদিন হাঁসঘর থেকে শিয়াল যখন বড় ডিমপাড়া মুরগীটা নিয়ে পালালো, জনের মা তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে লালুর উপর চড়াও হলো। একদিন রাতে গরু গোয়াল থেকে খুলে এসে গাদা থেকে ধান খেল। না-ডাকার অপরাধে জন সেদিন লালুকে সন্ধ্যা অবধি না খাইয়ে রাখলো।

এমনি করে সুখে-দুঃখে লালু আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেল। তখন ফাল্গুনের মাঝামাঝি। ধান কাটা শেষ। মাঠ ফাঁকা। খাল-বিল শুকিয়ে চৌচির।

এই সময় থেকে শুরু হয় ডাকাতির মরশুম। গোটা সুন্দরবন জুড়ে চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব। ডাকাতদল সারা বছরের আয়-উপার্জন করে নিতে উঠে পড়ে লাগে এ সময়। ধনী-নির্ধন বাছ-বিচার নেই। প্রতি রাতে এখানে সেখানে হানা দিয়ে যা পায় তাই-ই সংগ্রহ করে। দু'পাঁচজনকে জখম তো করেই। তার ওপর গৃহস্থ বেয়াদবি করে টাকা-পয়সা দিতে রাজী না হলে বিনা-দ্বিধায় তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সেদিন রাতে কিসের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, বাড়ি আলোয় আলোময়। বুঝলাম, বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সংগে সংগে কালি ঝুলি মাখা কালো প্যান্ট-গেঞ্জি পরা মাথায় ফেট্টি বাঁধা দুই ডাকাত আমায় জাপ্টে ধরে পিঠ-মোড়া করে বাঁধলো। জন ততক্ষণে জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে। একজন তার গালে মারলো দশাসই এক চড়। চড়ের ধাক্কা সইতে না পেরে জন হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লো খাটের কিনারায়। খাটের কোণা লেগে কপাল কেটে ঝরঝর করে ঝরতে লাগলো রক্ত। জন কেঁদে উঠলো। একজন ডাকাত ধম্‌কে উঠলো—চুপ্—একদম চুপ।

জনের উচ্চস্বরে কান্না বন্ধ হলো বটে, তবে তখনও সে

বন্দুকধারী আবার হুমকি দিল, এখনও বল কোথায় টাকা ?

ফোঁপাচ্ছে। এবার আমার মতো তাকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো। আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম—ওকে বেঁধে লাভ কি ?

—চোপ্‌। নিজের ভাবনা নিজে ভাব। দরোজা খুলতে বল...পিছন থেকে একজন গর্জে উঠে আমার মাথার উপর রামদা ধরলো।

আমাকে কিছুই বলতে হলো না। জনের মা নিজেই ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল। তড়িৎ গতিতে জনা পাঁচেক সশস্ত্র ডাকাত ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো। কারো হাতে রামদা, কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে লোহার ছুঁচালো লোহার রড। একজনের হাতে বন্দুক। আমাদেরও টেনে ঘরের ভিতর ঢোকানো হলো। মা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, একজন হেঁকে উঠ্‌লো—খবরদার, চেঁচালে কেটে দুখান করবো। মা নীরবে নাম জপ করতে থাকলেন। একজন তাঁর মাথার উপর কম্বল ছুঁড়ে দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিল।

এবার বন্দুকধারীর কঠোর নির্দেশে আমি ও গিন্নী দুজনেই নিজের নিজের চাবির গোছা দিয়ে দিলাম। গিন্নী তার নাক-কান-হাতের সোনার গয়না খুলে দিলো। মুহূর্তে কয়েকজন ডাকাত ঘর-তল্লাশীর কাজে তৎপর হলো। যেখানে যত বাক্‌স-পেঁটরা, পোঁটলা-পুঁটলি ছিল দক্ষ হাতে ক্ষিপ্রতার সংগে সবগুলো খুলে মূল্যবান যা কিছু নিয়ে নিল। ঘড়ি, আংটি, রেডিও, অলংকার, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, কাঁসার বাসন-কোসন কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতিয়ে নিল। সব কিছু গোছাবার পর দু তিনজন ডাকাত আমায় ঘিরে ধরলো।

বন্দুকধারী নির্মম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—আর টাকা কোথায় ?

বললাম—নেই। যা ছিল সবই তো নিয়েছেন।

—মিথ্যে কথা.... বলেই গর্জে উঠে একজন একটা ঘুঁষি মারলো আমার নাকে। নাক ও ঠোঁটের অনেকখানি কেটে গেল। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগলো। তবুও রেহাই পেলাম না।

আবার একই প্রশ্ন করা হলো আমাকে। একই জবাব দিলাম। সত্যি আমার কাছে টাকা ছিল না। দুর্বৃত্তরা সে কথা বিশ্বাস করলো না। আমার উপর চলতে থাকলো নানারকম দৈহিক নির্যাতন। আঘাতে আঘাতে সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত। সহ্যশক্তি শেষ হয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে

থাকবার ক্ষমতাটুকুও হারাতে বসেছি। একজন মশাল ধারী আমার সারা শরীরে মশালের আগুন ছোঁয়াতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠি, আর আর্তনাদ করি। তাছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার।

আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা জন আমার কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল স্থাণুর মত। তার সমস্ত বোধশক্তি অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে জনের দিকে তাক করে বন্দুকধারী ট্রিগারে আঙুল দিল। তার মা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেকে আড়াল করতে গেল, কিন্তু মাথায় ডান্ডার আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারালো।

বন্দুকধারী আবার হুমকি দিল—এখনও বল, কোথায় টাকা? আমি কিন্তু এক দুই তিন পর্যন্ত গুনবো। এই সময়ের মধ্যে না বললে—বাকিটা শেষ না করে সে জনকে টার্গেট করে বন্দুক তুললো।

এক...দুই....

শরীরের সমস্ত রক্তপ্রবাহ বোধ হয় নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। আতংকে চোখ বুজলাম। শেষবারের মত মনেপ্রাণে ভগবানকে স্মরণ করলাম।

তিন....গোনার সংগে সংগে প্রচন্ড শব্দে ফায়ার হলো। সে শব্দকে ছাপিয়ে এক প্রাণ-বিদারী আর্ত-চিৎকারও ভেসে এলো কানে। একটা ভারী কিছু যেন পড়ে গেল মাটিতে। ভয়ে ভয়ে চোখ খুললাম।

কিন্তু এ কী! চোখের সামনে কী দেখছি আমি! নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কি স্বপ্ন না সত্য!

জন তার জায়গায় ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে। আর তার হাত চারেক দূরে দাঁড়ানো ডাকাতটা রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করছে। শুধু তাই নয়—বন্দুকধারী ডাকাতটাও উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে। আর তার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লালু আহত ক্রুদ্ধ কেশরীর মত রুদ্ররোষে গর্জাতে গর্জাতে যেখানে সেখানে কামড় দিচ্ছে। বন্দুকটা ছিটকে পড়েছে কয়েক হাত দূরে। বন্দুকধারীও প্রাণপণ শক্তিতে লালুকে আঘাত করছে। লালুর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন আজ দৈব বলে বলীয়ান। কালান্তক যম। আঁচড়ে-কামড়ে বন্দুকধারীর দেহটা ফালাফালা করে দিতে সে বদ্ধপরিকর।

ঘটনার আকস্মিকতায় ঘরে অন্যান্য ডাকাতগুলো তখন হতভম্ব। সামান্য একটা নেড়িকুত্তার বাচ্চা, বোমা-বন্দুকের শব্দ শুনলে যারা ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবার পথ পায় না, এমনি করে সকলের অলক্ষ্যে ঘরে ঢুকে তাদের জাঁদরেল উপ-দলপতিকে এমনি করে ঘায়েল করবে, এ যে তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, ট্রিগার টানার ঠিক মোক্ষম মুহূর্তে অতর্কিতে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধাক্কা না দিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলিটা এমনি করে প্রিয়তম বন্ধুর বুকে বিঁধে তাকে ধরাশায়ী করতো না। এ যে অভাবনীয়—অকল্পনীয়।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সম্বিত ফিরে পেয়ে সশস্ত্র ডাকাতদের কয়েকজন একযোগে নানা দিক থেকে আক্রমণ করে লালুর দেহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললো। লালু কিন্তু সংকল্পচ্যুত হয় নি। লালু মরলো বটে, তবে মরার পূর্ব-মুহূর্তে বন্দুকধারীর গলায় মরণ-কামড় বসালো।

বাড়ির চারধারে গোলমাল তখন তুংগে উঠেছে। বন্দুকের দুই একটা উড়ো আওয়াজও শোনা গেল। অর্থাৎ গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে চৌধুরী বাবুদের বন্দুকটাও এসে গেছে।

কালবিলম্ব না করে ডাকাতদল জাল গুটিয়ে সরে পড়লো। রক্তে তখন সারা ঘর ভেসে যাচ্ছে। এত রক্ত দেখে মাথাটাও কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো।

সকালে জ্ঞান ফিরতে দেখি, বাড়িতে লোক গিজগিজ করছে। তারই মাঝে আমার মা লালুর মৃতদেহটা আঁকড়ে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন, আর জন লালুর চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথাটা কোলে নিয়ে পলকহীন চোখে শুধু তাকিয়েই আছে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আমার দেহের ক্ষত কিছু মিলিয়ে গেছে, কিছু মিলিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু লালু মনের মাঝে যে ক্ষত রেখে গেছে, তা আর মিলবে না কোনোদিন—এ জীবনে তো নয়ই।

সেই থেকে বাড়িতে আর আমরা কুকুর পুষি না। কেউ সে কথা বলেও না। লালুর জায়গায় অন্যকে বসাবো কেমন করে?

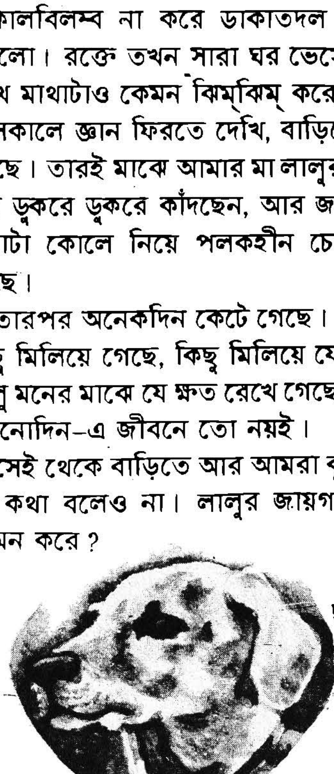

ছবিঃ দিলীপ দাস

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ রাত্রির অবসান। রাজগৃহের উপত্যকায় পাহাড়তলির কুসুমশোভিত সবুজ বনানীর ভেতর থেকে পাখির ডাক শোনা যেতে লাগলো। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, অধীর আগ্রহে সারা রাত জেগে বসে থেকেও বাবলুর দেখা পেলো না। গেল কোথায় সে? ওর কোন বিপদ হলে পঞ্চুরই তো ছুটে আসার কথা। তবে কি! তবে কি ওরা দুজনেই একসংগে বিপদে পড়েছে?

বিলু বললো-শোন, আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আমাদেরও এখুনি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। ঐ পাহাড়েই যাব আমরা। গুহায় ঢুকব। বাবলু মনে হয় ঐখানেই আটকে পড়েছে।

ভোম্বল বললো—এখানকার থানায় কি একটু জানিয়ে যাব?

—না। এখুনি নয়। তুই আর আমি গুহায় ঢুকবো। সংগে একটা বাঁশি থাকবে। বিপদ বুঝলেই বাঁশি বাজাবো। বাচ্চু বিচ্ছু বাইরে থাকবে। ওরাই গিয়ে খবর দেবে পুলিশকে।

বাচ্চু বললো—দি আইডিয়া। সেই ভালো। আগেই থানা পুলিশ করে কোন লাভ নেই।

ওরা সংগে সংগে তৈরি হয়ে দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এলো। তারপর একটা দোকানে ঢুকে অল্প কিছু খেয়ে নিল সকলে।

পরিচিত সেই টাংগাওয়ালাটা ওদের দেখতে পেয়ে গুটি গুটি হাজির হলো সেখানে—কি খোকাবাবু! ঘুমনে যাবেন তো? চলুন, মনিয়ার মঠ দেখিয়ে আনি। সোনভান্ডার দেখিয়ে আনি। রত্নগিরি.......।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু কোন কথা না বলে টাংগায় উঠে পড়লো। তারপর বললো—কোথাও যাব না আমরা। আপাততঃ তুমি আমাদের বৈভার পাহাড়ে নিয়ে চলো তো দেখি।

—আরে ব্বাঃ। স্রেফ বৈভার পাহাড়?

—হ্যাঁ। পরে আমরা সব কিছু ঘুরে দেখবো। এখন তো আমরা কিছুদিন আছি।

—লেকিন ও বড়া খোকাবাবু কাঁহা? ও কিধার গিয়া?

—মালুম নেহি।

—তব ক্যা হোগা। চলো বৈভার চলো। যো মর্জি তুমহারা।

প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে জলতরঙ্গের ধ্বনির মতো টুঙ্ টাঙ্ শব্দ তুলে টাঙ্গা ছুটে চললো। অজাতশত্রু গড় পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় টাঙ্গাটা আসতেই দেখা গেলো গলায় রুমাল বাঁধা কপালে টিপ্পা সুদর্শন চেহারার এক যুবক পান চিবোতে চিবোতে এসে হাজির হলো সেখানে। তারপর বুক ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললো—অ্যাই। কাঁহা যাওগে তুম সব। মাৎ যাও ইধার। জলদি ভাগো হিঁয়াসে।

টাঙ্গাওয়ালা বললো—ফালতু বকোয়াস মাৎ করো রঘুনাথ। হট্ যাও। লেড়কা লোগ্ ঘুমনে আয়া।

রঘুনাথ এবার অনেকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে রক্ত চক্ষুতে বললো—বেওকুফ কাঁহেকা। টাঙ্গা উলোট দেগা অভি। ভাগো হিঁয়াসে।

বিলু বললো—এ তো সেই গাইড। এ লোকটা আমাদের পথ আটকাচ্ছে কেন?

ভোম্বল বললো—কি আশ্চর্য! শুধু শুধু ভাগবো কেন আমরা?

রঘুনাথ বললো—তুম সব যাওগে কি নেহী? অভি ঘর চলা যাও। সামকো ভাগো হিঁয়াসে। আউর কভি মাৎ আনা ইধার। সমঝা?

ততক্ষণে টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা থেকে নেমে গজগজ করতে করতে টাঙ্গার মুখ ঘুরিয়ে নিলো ফিরে আসার জন্য।

বিলু বললো—রোখো রোখো। এদিকে যাচ্ছ কোথায়? আমরা বৈভার পাহাড়েই যাবো। টাঙ্গা চালাও।

—নেহী বাবু। এ ব্যাটা বহুৎ বদমাস। মার ডালেগা।

রঘুনাথ বললো—তুমকো ভি মারেগা। বহুৎ মারেগা। জিনে চাও তো ভাগো হিঁয়াসে।

ভোম্বল বললো—কি বাবা, সক্কালবেলাতেই ঝামেলা বাধাবে নাকি? রাস্তা ছাড়ো দেখি এখন।

রঘুনাথ তখন রাগের চোটে ঘোড়াটাকেই মারতে লাগলো। ঘোড়াটা মার খেয়ে চিঁ হি হি হি করে দুপায়ে খাড়া হবার চেষ্টা করতেই বাচ্চু বিচ্ছু ছিটকে পড়লো টাঙ্গা থেকে?

রঘুনাথ এক হাতে বিচ্ছুর ফ্রকটাকে মুঠো করে ধরে পুতুলের মতো অবলীলায় শূন্যে তুলে নিলো ওকে।

তারপর বললো—কি খোঁকি! কেমন লাগছে দুনিয়াটা? গপ্তধন লিবে?

বিচ্ছু সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

বিলু বললো—এই ছাড় বলছি। ছেড়ে দে শিগগির।

—ক্যা বোলা তুমনে?

—বলছি ছাড় ওকে। নাহলে মার খেয়ে মরে যাবি।

বলা মাত্রই বিচ্ছুকে নামিয়ে দিয়ে হিংস্র জন্তুর মতো থাবা উঁচিয়ে বিলুর দিকে এগিয়ে এলো রঘুনাথ।

বিলুও তৈরি হয়ে কোমরে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়ালো। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে শূন্যে দুটো ডিগবাজি খেয়ে আবার মাটিতে পড়লো। অদ্ভুত দৃশ্য। ঠিক যেন সার্কাসের পাকা খেলোয়াড় ও। ভাগ্যে জিমন্যাস্টিকটা শিখেছিলো।

রঘুনাথ থতিয়ে গেলো প্রথমটা।

সেই সুযোগে বিলু একবার মাটিতে উবু হয়ে বসেই ধনুকের ছিলার মতো লাফিয়ে ওর মাথা দিয়ে সজোরে গোত্তা মারলো রঘুনাথের চোয়ালে। রঘুনাথ ছিটকে পড়লো দু'হাত দূরে। তারপর যখন উঠে বসলো তখন ওর গালের কষ বেয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। একটা দাঁত টুকরো হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। আর একটা ঝুলছে। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কোনরকমের উঠে দাঁড়ালো। তারপর অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

ভোম্বল রঘুনাথের কাছে গিয়ে সোহাগের সুরে বললো—দেখছ কি ছোনা মানা? ডু ডু খাবে? খুব লাগছে বুঝি? এখন যাও। দাঁতের ডাক্তার দেখিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে নাও। ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবে। বলে সবাই এসে আবার টাঙ্গায় উঠলো।

ততক্ষণে অনেক লোকজন এসে পড়েছে সেখানে।

সবাই বললো—কি হয়েছে? কি হয়েছে ভাই?

বিলু বললো—কিছু না। এই লোকটা আমাদের চলন্ত টাঙ্গায় লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আপনারা পারেন তো ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

টাঙ্গাওয়ালা কাউকে কিছু না বলেই ছুটিয়ে দিলো টাঙ্গা। যেতে যেতে বললো—খোকাবাবু, তোমরা আর একদিনও থেকো না রাজগীরে। এই রঘুনাথ এখানকার নামকরা গুন্ডা। ওর দলবল যখন জানতে পারবে তখন কিছুতেই আস্ত রাখবে না তোমাদের। পুলিশকে পর্যন্ত ভয় খায় না ওরা। কাজেই যদি ভালো চাও তো ভাগ যাও হিঁয়াসে।

বিলুরা টাঙ্গাওয়ালার কথা শুনে মুষড়ে পড়লো।

বাবলু নেই, পঞ্চু নেই, তার মানে ওদের রক্ষা কবচই নেই। তাছাড়া বাবলু আর পঞ্চুকে না নিয়ে তো ওদের পালানোও অসম্ভব। যদিও বিপদ এখানে হাতের মুঠোয় তবুও ওদের থাকতেই হবে এখানে।

যাই হোক। ওরা বৈভার পাহাড়ের কোলে নেমে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলো। বেশ খানিকটা ওপরে ওঠার পর এক জায়গায় দেখলো কয়েকটা কুকুর একটা ঝোপের দিকে একবার করে 'ঘেউ ঘেউ' করে ছুটে যাচ্ছে আর পিছিয়ে আসছে।

বিলু বললো—ভোম্বল, একবার গিয়ে দেখে আয় তো কি ব্যাপার?

ভোম্বল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো। আর বিলু বাচ্চু বিচ্ছু ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগলো কুকুরগুলোর দিকে। কুকুরগুলো তাড়া খেয়ে পালালো।

ওরা সবাই তখন পাহাড়ের সিঁড়ি ছেড়ে একটু উচ্চস্থানে ঘন গাছপালায় ঘেরা একটি ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই দেখতে না পেয়ে হতাশ হলো ওরা। কুকুরগুলো যে কি দেখে চেঁচাচ্ছিলো তা ভেবেই পেলো না। হঠাৎ একটা কুঁই কুঁই শব্দে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো সেই কুকুরগুলো আবার এসেছে এবং ক্রমাগত নিচের দিকে মুখ করে কি যেন দেখে গর্ গর্ করছে আর চেঁচাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো ওরা—ঐ-ঐ তো পঞ্চু। কি বিপজ্জনক-ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে রয়েছে। কিন্তু বাবলু! বাবলু কই? তারও কি তবে ঐ দশা হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তবে তো বাবলু তার ওদের মধ্যে নেই। তার প্রাণহীন দেহটা নির্ঘাৎ পড়ে আছে ঐ অতলস্পর্শী খাদের ভেতর।

ওরা দেখল নাইলনের জালে জড়ানো পঞ্চু পাহাড়ের ঢালের গায়ে গভীর খাদের দিকে একটি গাছের ডালে আটকে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে সে। সে এমনই এক জায়গায় যেখানে ওদের কারো সাধ্য নেই যাবার। ওরা অসহায় দর্শকের মতো সেই দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু।

বিলু বললো—তোরা বোস। আমি এক্ষুণি আসছি। একটা শক্ত দড়ি আর কুয়োয় বালতি পড়ে গেলে তোলার কাঁটা কিনে আনছি। ঐ দিয়েই যেভাবেই হোক টেনে আনতে হবে পঞ্চুকে।

বাচ্চু বিচ্ছু বললো—ঠিক বলেছ বিলুদা। পঞ্চুকে ওখান থেকে উদ্ধার করার এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই।

বিলু বললো— আমি যাবো আর আসব। তোরা চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে বসে থাক এখানে।

ভোম্বল বললো—কিন্তু তুই একলা যাবি বিলু? আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। আমিও তোর সংগে যাই। বাচ্চু বিচ্ছু এখানে লুকিয়ে থাকুক। এদিকে কেউ বড় একটা আসবে বলে মনে হয় না। কেননা যদি তোর কোন বিপদ হয় তাহলে আমি অন্তত তোকে রক্ষা করতে পারব।

বাচ্চু বিচ্ছু বললো—হ্যাঁ, সেই ভালো। বিলুদাকে একলা ছাড়া উচিত হবে না। আমরা দুজনে এখানে ঠিকই থাকতে পারবো।

বিলু বললো—খবরদার। তোরা দুজনে থাকবি কি? ভোম্বলও থাকবে তোদের সংগে। আমার জন্য চিন্তা করিস না। এটা দিনের বলা। কোন ভয় নেই। বিপদ ঘটলে চেঁচিয়ে লোকজন জড় করে ফেলবো।

এমন সময় হঠাৎই এক কান্ড ঘটে গেলো। এটাকে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলা উচিত। হঠাৎ সেখানে কোথা থেকে একপাল হনুমান লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। যেই না আসা কুকুরগুলো অমনি হাউ হাউ করে তেড়ে গেলো তাদের দিকে। তারপর হনুমান ও কুকুরে সে কি দারুণ যুদ্ধ! ভয়ংকর লড়াইয়ের মতো অবস্থা আর কি। কুকুরগুলোর ওপর হনুমানরা এত বেশি বিরক্ত হলো যে তাদের সমস্ত রাগ তখন গিয়ে পড়ল পঞ্চুর ওপর। খাদের ঢালে গাছের ডালে আটকে থাকা পঞ্চুকে ঐ অবস্থায় দেখে সেখান থেকে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে এলো ওরা। তারপর বন্দী পঞ্চুকে সবাই মিলে পেটাতে লাগলো। অসহায় পঞ্চু চিৎকার করতে লাগলো জালের ভেতর থেকে। বিলুরা তখন না পারলো পঞ্চুর নির্যাতন সহ্য করতে না পারলো এগোতে। হনু-কুকুরের সেই যুদ্ধে ওরা নিতান্তই অসহায়। যদি কোনরকমে রাগটা পঞ্চুর ওপর থেকে ঘুরে গিয়ে ওদের ওপর এসে পড়ে তাহলে আর দেখতে হবে না। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওদের। অথচ এই অত্যাচারের হাত থেকে পঞ্চুকে রক্ষা করা একান্তই দরকার।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাই বিলুদের এগিয়ে যেতে হলো না। কুকুরগুলোই তখন পঞ্চুর অবস্থা দেখে আক্রমণকারী হনুমানগুলোর দিকে তেড়ে গেল। সে এক প্রচন্ড চিৎকার, হট্টগোল আর দাপাদাপি। বনভূমি তোলপাড় যাকে বলে। পান্ডব গোয়েন্দারা এ যাবৎ অনেক কিছুই দেখছে কিন্তু হনু-কুকুরের এই রকম যুদ্ধ কখনো দেখেনি। হনুমানগুলোও বদের ধাড়ি। কুকুরগুলো ওদের দিকে যত তেড়ে যায় ওরা ততই অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে ওদের

আক্রমণ বাঁচিয়ে কুকুরগুলোর পিঠে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে। আর কুকুরগুলো তখন রাগেই হোক, দুঃখেই হোক বা অস্বস্তিতেই হোক 'গ্যা গ্যা' করে ডাক ছাড়ে। কুকুরে কখনো 'গ্যা গ্যা' করে না। কিন্তু যেভাবেই হোক ওদের গলার স্বর তখন ঐরকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো।

ওরা যখন এইভাবে নিজেদের মধ্যে মারামরিতে ব্যস্ত বিলু তখন ছুটে গিয়ে ছুরি দিয়ে জাল কেটে পঞ্চুকে মুক্ত করলো। পঞ্চু কোন রকমে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝাড়া দিয়ে কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

বিলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললো—বাবলু কই রে পঞ্চু ? বাবলু ? সে কোথায় ?

পঞ্চু তখন কুঁই কুঁই করে কি যেন বলার চেষ্টা করলো। কিন্তু বলতে পারলো না।

ওরা তখন সেখান থেকে সরে এসে যেই না গুহার দিকে যাবার চেষ্টা করল অমনি পঞ্চু প্যান্ট কামড়ে টানতে লাগল নিচের দিকে।

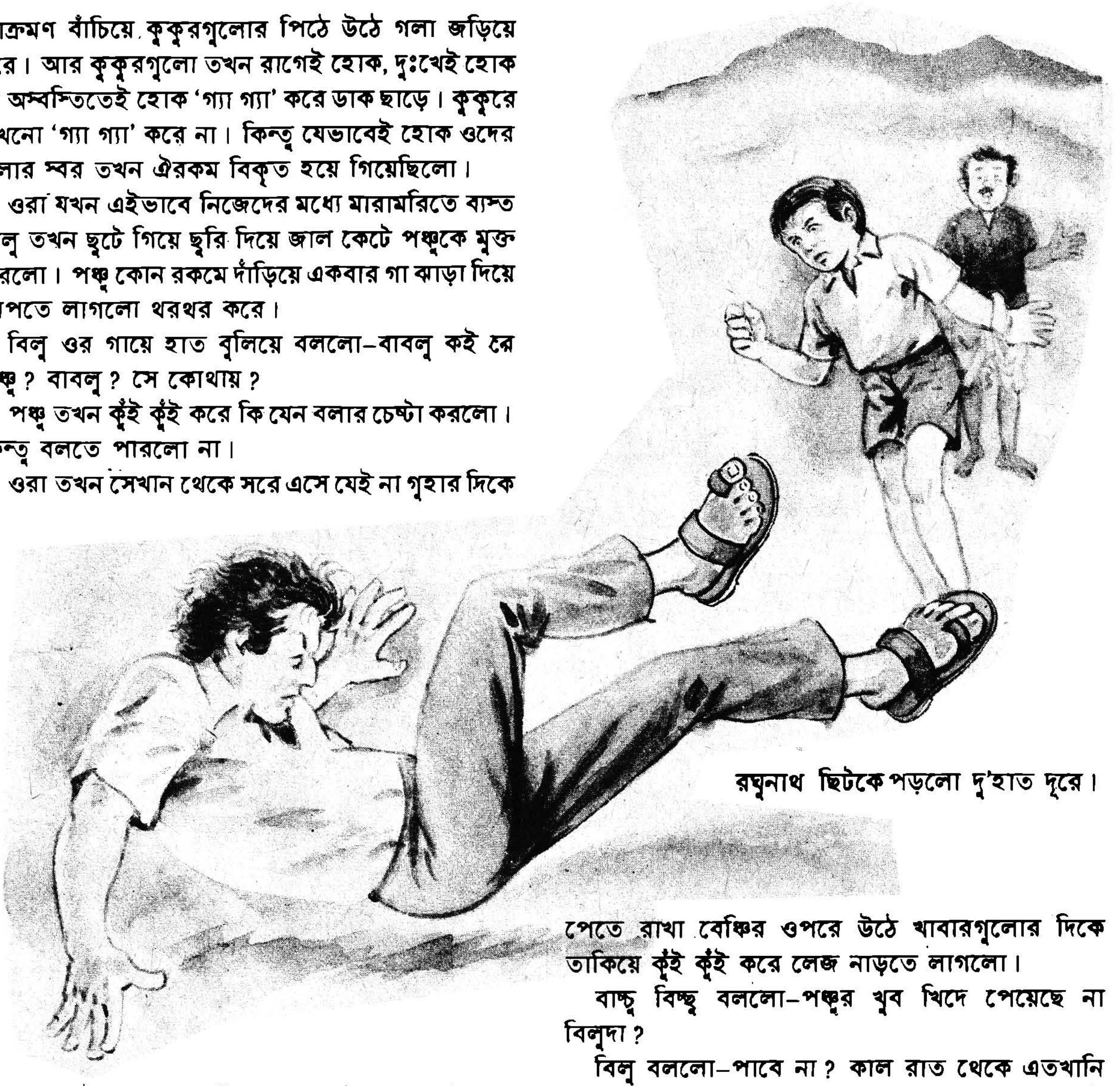

রঘুনাথ ছিটকে পড়লো দু'হাত দূরে।

বিলুরা বুঝলো হয় বাবলু গুহায় নেই। অথবা ওখানে গেলে বিপদ। তবে কি কাল সন্ধ্যেবেলা গুহায় ঢুকতে গিয়ে যা দেখে পঞ্চু ভয় পেয়েছিল তাই ওর বিপদের কারণ হলো ? ওরা তখন পঞ্চুর নির্দেশ মতো নিচে নামতে শুরু করলো। বেশ কয়েক ধাপ নামার পর 'জরাসন্ধ কা বৈঠক' এলো। তার নিচেই একটি হোগলার ছাউনি দেওয়া দোকানে মুড়ি তেলেভাজা জিলিপি চা এইসব হচ্ছিল। পঞ্চু সেখানে ছুটে গিয়ে দোকানের সামনে একটা পেতে রাখা বেঞ্চির ওপরে উঠে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়তে লাগলো।

বাচ্চু বিচ্ছু বললো—পঞ্চুর খুব খিদে পেয়েছে না বিলুদা ?

বিলু বললো—পাবে না ? কাল রাত থেকে এতখানি বেলা অবধি না খেয়ে আছে বেচারি। বলেই দোকানদারকে পঞ্চুর জন্য মুড়ি তেলেভাজার অর্ডার দিয়ে নিজেরা চা খেলো।

পঞ্চু তো গোগ্রাসে মুড়ি তেলেভাজা খেয়ে পাশেই রাখা একটা জালার দিকে ছুটে গেলো। অর্থাৎ জল চাই।

বিলু একটা মগে করে জল নিয়ে একটি পরিত্যক্ত মাটির পাত্রে ঢেলে পঞ্চুকে জল খাওয়ালো। এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বেচারি। দেহটাকে টান টান করে একবার গা-টাকে ঝাড়া দিয়ে স্বভাবসুলভ ডেকে উঠলো-ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।

আবার শুরু হলো অবতরণ।

কিন্তু সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে নেমেই অবাক হবার পালা। দেখল দারুণ উত্তেজনায় অধীর হয়ে পাহাড়ে উঠে আসছে বাবলু। ওর সারা মুখে উত্তেজনার ছায়া।

বিলুরা সোল্লাসে এবং সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ডাকল—বাবলু!

বাবলু বললো—আরে! আমি তো ঘরে ফিরে তোদের দেখতে না পেয়ে তোদেরই খোঁজে আসছিলাম। পথে টাংগাওয়ালটার সংগে দেখা হতে সেই বললো তোরা এখানে এসেছিস। কিন্তু কেন এলি? পঞ্চু নেই, আমি নেই, কেন তোরা এই বিপদের ঝুঁকিটা নিতে এসেছিলি?

বিলু বলল—এই ঝুঁকিটা আমরা নিয়েছিলাম বলেই পঞ্চুকে আজ ফিরে পেলাম। তাছাড়া কাল সারা রাতে তুই এলি না, আজ সকালেও তোর দেখা নেই। এর পরও আমরা চুপচাপ কি করে বসে থাকি বল? কিন্তু ব্যাপার কি তোর? কোথায় ছিলি তুই? তোর কোন বিপদ হয়নি তো?

—বিপদ? বিপদের চরম হয়েছিল। বহু কষ্টে বেঁচেছি। এখন বল পঞ্চুকে পেলি কি ভাবে?

বিলুরা তখন সব কথা খুলে বললো।

শুনেই লাফিয়ে উঠলো বাবলু—বলিস কিরে! কিন্তু তোরা কি বোকা। যে কুকুরগুলোর জন্য পঞ্চুর হদিস পেলি যে হনুমানগুলো ঐ বিপজ্জনক ঢাল থেকে পঞ্চুকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো তোরা তাদের জন্য কিছু না করেই চলে আসছিলি?

—কি করব?

—কি আবার করবি? সন্দেশ খাওয়াবি, রসগোল্লা খাওয়াবি, সিঙাড়া জিলিপি খাওয়াবি। চল চল। শিগগির চল।

বাবলুর নির্দেশ মতো বিলু আর ভোম্বল গেল সন্দেশ রসগোল্লা কিনতে। আর বাবলু করল কি কুণ্ডের কাছে নেমে গিয়ে বড় বড় দু কাঁদি কলা কিনল। তারপর এক গাদা মুড়ি তেলেভাজা কিনে দোকানদারের কাছ থেকে একটি থলির বস্তা চেয়ে কলা মুড়ি তেলেভাজা সব ঢোকাল তার ভেতর। নাহলে অর্ধ-পথেই কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে এগুলো নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলু ভোম্বল এলো। এখানকার সন্দেশ বলতে প্যাঁড়া আর রসগোল্লা নিয়ে। তারপর সমবেতভাবে আবার পর্বতাভিযান।

রণক্ষেত্রে গিয়ে দেখলো যুদ্ধ তখন চরমে। হনুমানগুলো গাছের ডালপালা ভেঙে কুকুরগুলোকে তাড়া করছে। আর কুকুরগুলো সমানে চিৎকার করে ওদের জ্বালাতন করছে এবং কামড়াবার চেষ্টা করছে।

বাবলুরা সেখানে গিয়ে 'আয় আয়' বলে ডাকতেই হঠাৎ যুদ্ধটা থেমে গেলো। কুকুরগুলো প্রত্যাশায় ছুটে এলো ঘেউ ঘেউ করে। আর হনুমানগুলো তাদের কালো কালো মুখ বাড়িয়ে মাজনের বিজ্ঞাপনের মতো ঝকঝকে দাঁত বার করে দেখাতে লাগলো ওদের।

বাবলু নিজের হাতে ওদের দিকে প্যাঁড়া আর রসগোল্লা ছুঁড়ে দিতে লাগলো। ব্যস। যুদ্ধ শেষ।

কুকুর ও হনুমানগুলো দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি ভুলে টপা টপ রসগোল্লা কুড়িয়ে গালে পুরে মধুর রসাস্বাদন করতে লাগলো। এবং আরো পাবার আশায় বাবলুদের দিকে তাকাতে লাগলো। বাবলুরা তখন পাহাড়ি পথের দুধারে একদিকে কুকুরদের জন্য সিঙাড়া জিলিপি মুড়ি এবং অন্যদিকে হনুদের জন্য কলার ছড়াগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগলো।

একদিকে কুকুরগুলো যেমন ঐসব খেতে লাগল অন্যদিকে হনুমানরাও কলা পেয়ে বেজায় খুশি হয়ে পাথরের ওপর সার দিয়ে বসে খোসা ছাড়িয়ে খেতে লাগলো। খাওয়া শেষ হলে কুকুরগুলো এসে বাবলুদের চারপাশ ঘুরে লেজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। হনুমানগুলোও 'উপ্ আপ্' করে গাছের ডালে উঠে শান্ত হয়ে বসে রইলো ওদের দিকে চেয়ে।

বাবলুরা আর অপেক্ষা না করে নেমে এলো নিচে। তারপর সোজা বাসায়।

বাসায় ফিরে সর্বাগ্রে বাথরুমে ঢুকে বেশ আয়েস করে স্নান করে নিলো বাবলু। তারপর শরীরটা একটু ঝর-ঝরে হলে ঘরের ভেতর গুছিয়ে বসে গত রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো সকলকে।

গত রাত্রে পঞ্চুকে নিয়ে নৈশ অভিযানে বেরিয়ে বৈভার পাহাড়ের কাছাকাছি পৌছতেই ওর মনে হলো কে যেন ওকে অনুসরণ করছে। তাই যেই না সে ওদিকে নজর দিতে যাবে অমনি সেই লোকটি বড় একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। আর পঞ্চু করলো কি ভৌ ভৌ রবে ছুটে গেলো তার দিকে। ততক্ষণে চোখের পলকে পিছন থেকে একজন এসে অবলীলায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো বাবলুকে। বাবলু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেলো ঘটনাটা। বাবলুর চিৎকারে পঞ্চুও ওদিক

থেকে ছুটে এলো এদিকে। তারপর আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগল লোকটাকে। লোকটি তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য বাবলুকে ছেড়ে দিতেই আর দুজন ছুটে এলো বাবলুর দিকে। তাদের একজনের হাতে ছিল নাইলনের একটি জাল। সেই জালে সে নিমেষের মধ্যে জড়িয়ে ফেললো পঞ্চুকে। পঞ্চু জালে বন্ধ হয়ে প্রচন্ড চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু তাকে টানতে টানতে পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলে গেল লোকটা। এদিকে বাবলুও নিজের মুক্তির জন্য প্রচন্ড ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। কিন্তু ওর সাধ্য কি সেই আসুরিক শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে?

ওদিক থেকে তখন 'গুড়ুম গুড়ুম' করে দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল। কে ছুঁড়ল কে জানে, বাবলুকে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল তাদেরই একজন রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

বাবলুর কথা এতক্ষণ সবিস্ময়ে শুনছিলো সকলে। শুনতে শুনতে বিলু হঠাৎ প্রশ্ন করলো—আচ্ছা বাবলু, ঐ গুলিটা তাহলে ছুঁড়লো কে?

—ঐটাই তো রহস্য। তবে আমার মনে হয় যে লোকটা আমাকে অনুসরণ করছিলো বা পঞ্চু যাকে তেড়ে গিয়েছিল সেই ছুঁড়েছিল গুলিটা। এরা মনে হয় গুপ্তধনের সন্ধানী পরস্পরবিরোধী দুটো দল। তবে মজার ব্যাপার এই যে, ঐ লোকই কিন্তু টেলিফোনে পুলিশকে খবর দেয় রাতের অন্ধকারে তিনি একজনকে খুন করেছেন বলে এবং আমি অপহৃত হয়েছি বলে। তাছাড়া কুকুরে আঁচড়ানো লোকটি চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তারখানায় বা হাসপাতালে গেলে তাকে সেখানে গ্রেপ্তার করে তার দলের লোকেদের নাম আদায় করবার অনুরোধও করেছেন তিনি।

ভোম্বল বলল—বাবা। এ তো সাংঘাতিক লোক দেখছি!

বাচ্চু বিচ্ছু বললো—তাহলে আমরা যার নজরে আছি ইনিই সেই লোক নন তো?

বাবলু বললো—আমার মনে হয় তাই।

বিলু বললো—তোকে তাহলে উদ্ধার করল কে? পুলিশ?

—না। আমি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করেছি।

—কিরকম!

—ওরা আমাকে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে এলো ওদের ডেরায়। আমি আরও বাধা দিতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছে করেই দিই নি। কেননা আমিও মনে মনে চাইছিলাম বন্দী হয়ে ওদের ডেরাটা একবার ঘুরে আসতে। যাই হোক, ওরা আমাকে বিপুল পাহাড়ের কাছে একটা বাড়িতে এনে তুললো। বাড়িটা বহুদিনের পুরনো। সেই বাড়িরই একটি ঘরে আমাকে বন্দী করে রেখে চলে গেলো ওরা।

—তারপর?

—তারপর বেশ কিছু সময় কেটে যায়। একা ঘরে অন্ধকারে আমি চুপচাপ বসে থাকি। অনেক পরে আলো নিয়ে ঘরে ঢুকলো সুশ্রী চেহারার একজন লোক। লোকটিকে তোরাও চিনবি। বৈভার পাহাড়ের সেই গাইড।

বিলু বললো—আরে! ঐ লোকটাই তো আমাদের টাংগা আক্রমণ করেছিল আজ। তবে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি ওকে। কি বললো লোকটা তোকে?

—লোকটির প্রথম প্রশ্ন আজ সন্ধ্যেবেলায় আমরা ওর নিষেধ সত্ত্বেও সপ্তপর্ণী গুহায় ঢুকেছিলাম কেন?

—সেকি! ও জানল কি করে?

—হয়তো পরে ঘুরে এসে আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখেছে। নয়তো ওর কোন ইনফরমার ছিল কাছেপিঠে, সেই খবর দিয়েছে।

—লোকটির দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি অত রাতে পঞ্চুকে নিয়ে ঐ পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম কেন?

—বেশ করছিলাম। আর?

—তৃতীয় প্রশ্ন ডাঃ ললিতমোহন পালচৌধুরী আমাদের কে হন? এবং শেষ প্রশ্ন সপ্তপর্ণী গুহার ম্যাপটা এবং ঐ শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা কাগজটা কার কাছে আছে?

—তুই কি বললি?

—বললাম ললিতমোহনবাবুকে আমরা চিনিই না। আর ঐসব কাগজ বা নক্সার ব্যাপারওকিছু জানি না আমরা। গুহায় ঢুকছিলাম নেহাতই কৌতূহলের বশে। অর্থাৎ গুহাটা কত বড় তা দেখবো বলে। আর রাত্রিবেলা পঞ্চুকে নিয়ে কেন যাচ্ছিলাম? আমাদের মেয়েদের একজনের একটি কানের দুল জরাসন্ধ কা বৈঠকে ছুটোছুটি করতে গিয়ে পড়ে গেছে মনে হলো তাই।

বিচ্ছু বললো—বাঃ। চমৎকার উত্তর দিয়েছিস তো।

—দিলে কি হবে। শয়তানের ধাড়ি একটা। বললো, ও সব কহানি দুসরা আদমিকে শোনাবে খোকাবাবু। রঘুনাথকো নেহী। জিনে চাও তো সাচ্চা বাত বতাও। ও ললিতমোহন হামারা দুশমণ। ও বদমাশ তুম সবকো

পুলিশটা খেঁকিয়ে উঠল ভাগো হিঁয়াসে।

ভেজা হিঁয়া পর। সব কুছ মালুম হ্যায় হামারা। আমি রেগে বললাম, মুখ সামলে কথা বলবে রঘুনাথ। ললিত-মোহনবাবুর সম্বন্ধে কোন রকম বাজে কথা বলবে না। তখন রঘুনাথ হেসে বললো, তব তো তুমনে মান লিয়া ভাই ও ললিতমোহন তুমহারা আদমি। আমি বললাম—হ্যাঁ। ললিতমোহন আমার দাদুভাই হন। আমরা এখানে এসেছি গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে নয়। তাঁর ছেলে রাজীবমামার খোঁজে।

ভোম্বল বলল—তুই স্বীকার করে ফেললি?

—দেখ, এত কথা যারা সি.আই.ডির মতো পিছনে লেগে সংগ্রহ করেছে তাদের কাছে আর লুকোছাপার দরকার আছে কিছু? আমার তো মনে হয় সরাসরি সব কিছু বলেই ফয়সলা করে নেওয়া ভালো।

—তা কি বললো ও?

—বললো, বেশ তো। ও রাজীববাবু তো আমাদের কাছেই আছে। ঐ সব কাগজপত্তর আমাদের হাতে তুলে দিলেই আমরা ছেড়ে দেবো রাজীববাবুকে। কিন্তু ঐ ললিতমোহনবাবুর গুপ্তধনের লোভ এত বেশি যে ঐ কাগজও দিবেন না আমাদের, ছেলেও ফেরৎ লিবেন না।

—কেন দেবেন উনি? সামান্য অপরাধের জন্যে আজ কি অবস্থা করেছেন আপনারা তাঁর? ঐ মানুষটির নিরীহ স্ত্রী কন্যারা কি দোষ করেছিল আপনাদের কাছে?

—নেহী খোকাবাবু। ওনার স্ত্রী কন্যাকে আমরা মারি নি। ঐ সব ঝুটা বাত বলবে না। ঐ ললিতমোহন তোমাদের এই কথা বুঝিয়েছে। কিন্তু সে জানে না এ কাজ করেছে রামজী আর কেশবজীর দল। ওরাই আমাদের আসল শত্রু। ওরা আমাদের বিপদে ফেলার জন্য এই কাজ করেছিল। আর ললিতমোহনবাবুর কথা যদি বলো তো ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

আমি বললাম—আচ্ছা রঘুনাথজী, আমরা যদি ঐসব কাগজপত্তর গুলো আপনাদের হাতে তুলে দিই তাহলে আপনারা মুক্তি দেবেন রাজীব মামাকে?

—জরুর দেগা।

—কিন্তু ঐ রামজী কেশবজীর ঠিকানাটা যে আমরা চাই?

—রামজী কেশবজীর ঠিকানা নিয়ে কি করবে? বখরি হো কর শের মারোগে ক্যা?

আমি বললাম—শুনুন রঘুনাথ জী, ঠাট্টা করবেন না, যদি আসল কাজ বাগাতে চান তাহলে রাজীবমামাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। সাথ সাথ হিসাব পুরা কর দেগা। অর্থাৎ ঐ নক্সা ও কাগজ আমি তুলে দেবো আপনাদের হাতে। ওতে আমাদের কোন লোভ নেই। কেননা হাজার হাজার বছর পার হয়ে যাবার পরও যে গুপ্তধন কেউ নিতে পারেনি তা কখনো আমরা উদ্ধার করতে পারি? আপনারাও পারবেন না। মাঝখান থেকে মরবেন নিজেদের ভেতর মারামারি করে।

—ও বাদ মেদেখা যায়গা। আভি হাম এক আদমি কো ভেজেগা। ওর হাতে যা কিছু দেবার দিয়ে দাও। রাজীবকে পেয়ে যাবে।

—আর রামজী কেশবজীর ঠিকানা?

—বাণগঙ্গা গিরিপথ কা পাশ চলা যাও, মিল যায়েগা।

এবার আমি ওদের দলের একজন লোককে নিয়ে আমাদের বাসার কাছাকাছি ফিরে এলাম। এসে বললাম কাগজ পত্তরগুলো নিয়ে আসছি। তুমি কিন্তু কথা মতো নিয়ে এসো রাজীবমামাকে।

লোকটি হেসে বললো তুমহারা রাজীব জিন্দা নেহী খোকাবাবু। বহুত পহলেই মর চুকা। অভি যো কুছ দেনা হ্যায় দে দো। নেহী তো...বলেই একটা স্প্রিং দেওয়া ছুরি বার করলে সে।

বাবলু সভয়ে একটু পিছিয়ে এসেই ওর পিস্তল তাগ করলো। তারপর একটুও দ্বিধা না করে ট্রিগার টিপতেই 'ডিস্যুম'।

লোকটি ভাবতেও পারেনি এমন অঘটন ঘটে যাবে। গুলিটা ডানদিকের কাঁধে লেগেছিল। লোকটি এক হাতে

সেখানটা চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠলো—এ ক্যা কর দিয়া তুমনে। গোলি চালা দিয়া ? দেখিয়ে তো কিতনা খুন নিকালতা।

বাবলু বললো—আরো গুলি করব। বাঁচতে চাও তো ভাগো এখান থেকে। চারশো বিশ কাঁহাকা।

লোকটি দৌড়ে পালাল সেখান থেকে।

এই পর্যন্ত বলার পর বাবলু একটু থামলে বিলু বললো—ও। এইবার বুঝতে পেরেছি রঘুনাথ কেন অত ক্ষেপে উঠে টাংগা আক্রমণ করেছিল।

বাবলু আবার বললো—এরপর আমি বাসায় না ফিরে সোজা থানায় চলে যাই। এবং সব কথা খুলে বলি পুলিশকে। কিন্তু মুশকিল হলো এখানকার পুলিশ আমার কোন কথা বিশ্বাস তো করলোই না, বরং পিস্তলটাও কেড়ে নিলো। তার ওপর অনেক বেলা পর্যন্ত আটকে রাখলো আমাকে।

—তাহলে তুই ছাড়া পেলি কি করে ?

—অনেক পরে ওরা নিজেরাই ছেড়ে দিলো। সম্ভবতঃ আমাদের সেই অদৃশ্য বন্ধুর সুপারিশেই হয়তো ছাড়া পেয়েছি আমি। এবং পুলিশ আমাকে রীতিমতো শাসিয়ে বলেছে আজই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে।

—সেকি !

—হ্যাঁ। যতক্ষণ না ওয়েস্ট বেংগল পুলিশের সংগে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি ততক্ষণ আমরা এখানে নিরাপদ নই। শুধু তাই নয়, থানায় কথাবার্তা বলার সময় আমার যা মনে হলো তাতে বুঝলাম এখানকার পুলিশের একাংশও ঐ দলগুলির সংগে যুক্ত।

—কিন্তু ওয়েস্ট বেংগল পুলিশের সংগে কি করে যোগাযোগ করবি ?

—স্টেশন থেকে ট্রাংক টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হবে।

—তাহলে আর দেরি না করে এখনই চল।

—হ্যাঁ যাবো। উইথ ব্যাগ এ্যান্ড ব্যাগেজ।

বিলু বললো—তুই কি সত্যিই চলে যাবি বাবলু ? তাহলে তোর দাদুভাইয়ের কাজের কি হবে ?

বাবলু হেসে বলল—মেঘ না চাইতেই জল তো আমরা পেয়ে গেছে। কাজেই সে কাজও হবে। তবে এখান থেকে চলে যাওয়াটা আমাদের ভান মাত্র।

এই বলে সব বাঁধাছাঁদা করতে লেগে গেলো ওরা।

এমন সময় জনার্দনবাবু এসে হাজির—এই যে ছোকরারা। বলি কি কান্ড বাধিয়ে বসে আছ সব ? অ্যাঁ ! তার ওপর এইসব তল্পিতল্পা গুটিয়ে চললে কোথায় ?

বাবলু বললো—শুনেছেন তো সবই। এখানে থাকাটা ঠিক নয়। তা আপনার কতো হয়েছে বলুন মিটিয়ে দিই।

—আমার পাওনা আমি পেয়ে গেছি বাবা।

—সেকি ! কে দিল ? আমরা তো দিই নি।

—যে হোক দিয়েছে। কিন্তু তোমরা চলে গেলে আসল কাজের কি হবে ? যে কাজের জন্যে তোমরা এসেছিলে ?

—আপনি জানেন, আমরা কেন এসেছিলাম ?

—জানি বৈকি বাবা। তোমার দাদুভাই ললিত মোহন পালচৌধুরী আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই বাড়িটা তাঁরই টাকায় সম্প্রতি কিনেছি। ট্রেনের কামরায় সশস্ত্র একজন লোককে তোমাদের রক্ষার জন্য তিনিই নিযুক্ত করেছিলেন। আর সেই জন্যেই এক ছিঁচকে চোর তোমাদের মালপত্তর চুরি করে পালাবার সময় ধরা পড়ে এবং পরে সেগুলো তোমরা আবার ফেরত পাও। বক্তিয়ারপুরে তিনিই দোকানদারকে বলে রেখেছিলেন তোমরা ওখানে কিছু খেলে দাম না নিতে। আমাকেও তিনি অগ্রিম টাকা পয়সা দিয়ে রেখেছেন। আর ঐ টাংগাওয়ালা আমার লোক।

বাবলু বললো—আমার দাদুভাই কোথায় ? তিনি কি এখানেই আছেন ? যদি থাকেন তাহলে তাঁকে বলে দেবেন আমাদের নিতান্তই ছেলেমানুষ ভেবে আমাদের নিরাপত্তার দিকে অযথা নজর দিতে গিয়েই সর্বনাশ করেছেন তিনি। কারণ সব কিছু জানাজানি হয়ে গিয়ে আমরাই বিপদে পড়ে গেলাম। আমাদের আত্মরক্ষার পিস্তলটি পর্যন্ত আমরা খুইয়েছি। এখানে আর কোন তদন্ত করা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই চলে যাচ্ছি।

বাবলুরা সব কিছু বেঁধে ছেঁদে বাইরে আসতেই টাংগা পেয়ে গেল। সেই টাংগা। টাংগাওয়ালা বললো—কি খোকাবাবু, চলে যাচ্ছেন ? যান যান। জলদি ভাগুন

বাবলুরা টাংগায় উঠে চলে যাবার আগে আর একবার থানায় এলো। এসে বললো—আপনাদের কথা মতো চলে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু পিস্তলটা কি ফেরৎ পেতে পারি ?

পুলিশটা খেঁকিয়ে উঠল—মারে থাপ্পড়। ভাগো হিঁয়াসে।

বাবলুরা বিরস বদনে রাজগীর বাস স্ট্যান্ডে এসে বক্তিয়ারপুরের বাসে উঠলো। সেই বাসে চেপে ওরা সোজা চলে এলো নালন্দায়। আপাততঃ এইখানেই ঘাপটি মেরে বসে থাকা যাবে। তারপর এখান থেকেই শুরু হবে ওদের প্রকৃত অভিযান। টারগেট রামজী ও কেশবজী।

ছবি : দিলীপ দাস

[চলবে]

বাঘ, হায়না ও শেয়াল

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

সে অনেক কাল আগের কথা। সেই পুরনো কালের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। সেই কালে এক বিরাট ঘন বনের মধ্যে থাকত এক বাঘ। সব পশুপাখি সেই বনে খুব সুখেশান্তিতে থাকত। বাঘ তাদের শিকার করত না। সে যেত অন্য বনে। অন্য বনের কেউ এই বনে ঢুকতে সাহস পেত না। বাঘের ভয়ে। এ বনের পশুপাখিরাও খুব মান্য করত বাঘকে। বাঘ ছিল তাদের রাজা।

একদিন হয়েছে কি সেই রাজা বাঘ গিয়েছে অন্য বনে। শিকার করতে। শিকার করেছে মস্ত বড় একটা হরিণ। লোভে পড়ে অনেকটা মাংস খেয়ে ফেলেছে। তারপর কোনো রকমে ফিরে এসেছে পাহাড়ী গুহায়। এদিকে তার পেট তো ফেটে যাবার যোগাড়। বুক ওঠানামা করছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। পেটের ব্যথায় চোখে জল এসে পড়ছে। বাঘ গুহার সামনে গড়াগড়ি দিচ্ছে, ছটফট করছে। এবার বুঝি মরেই যাবে।

অল্প দূরে বসে ছিল এক হায়না। বাঘ তাকে ডাকল। বলল, হায়না, আর বোধহয় বাঁচব না। সব শেষ হয়ে আসছে। তুমিই হবে এ বনের রাজা। সব পশুপাখিকে খবর দাও। তারা শেষবারের মতো তাদের রাজাকে দেখে যাক। বাঘ কথা শেষ করে হাঁপাতে লাগল।

ব্যাপার স্যাপার দেখে হায়নার তো চোখ ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। সে হবে বনের রাজা? সবাই মানবে তাকে? আঃ! পশুরাজ হায়না! রাজা হবার আনন্দে দু-চারবার লাফিয়েও নিল হায়না। কিন্তু বাঘটা তাড়াতাড়ি মরছে না কেন!

হায়না ভাবল, এত বড় বন। ঘুরে ঘুরে সবাইকে খবর দিতে হবে, বড়ই কষ্টের। দুদিন পরেই তো রাজা হব। সবার কাছে গিয়ে খবর দেওয়া কি আর মানায়? তার চেয়ে অন্য কাউকে পাঠানো যাক। আমি বরং বাঘের কাছে কাছেই থাকি। দেখি কোন্ কোন্ পশুপাখি বাঘের কাছে আসে। দুদিন পরে তো আমিই হব ওদের রাজা।

ঠিক এই সময়ে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটা কাক। হায়না কাককে ডেকে সবাইকে খবর দিতে বলল। হায়নার গলায় যেন আদেশের সুর।

কাক খারাপ খবর দিতে ওস্তাদ। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই খবর পেয়ে গেল,—তাদের প্রিয় রাজা মরে যাচ্ছে।

খবর পেয়েই সব পশু ছুটে এল রাজার গুহায়, সব পাখি উড়ে এল বাঘের গুহায়। সবাই হাত জোড় করে প্রার্থনা শুরু করল তাদের প্রিয় রাজা যেন ভালো হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক পশুরাজ বাঘ।

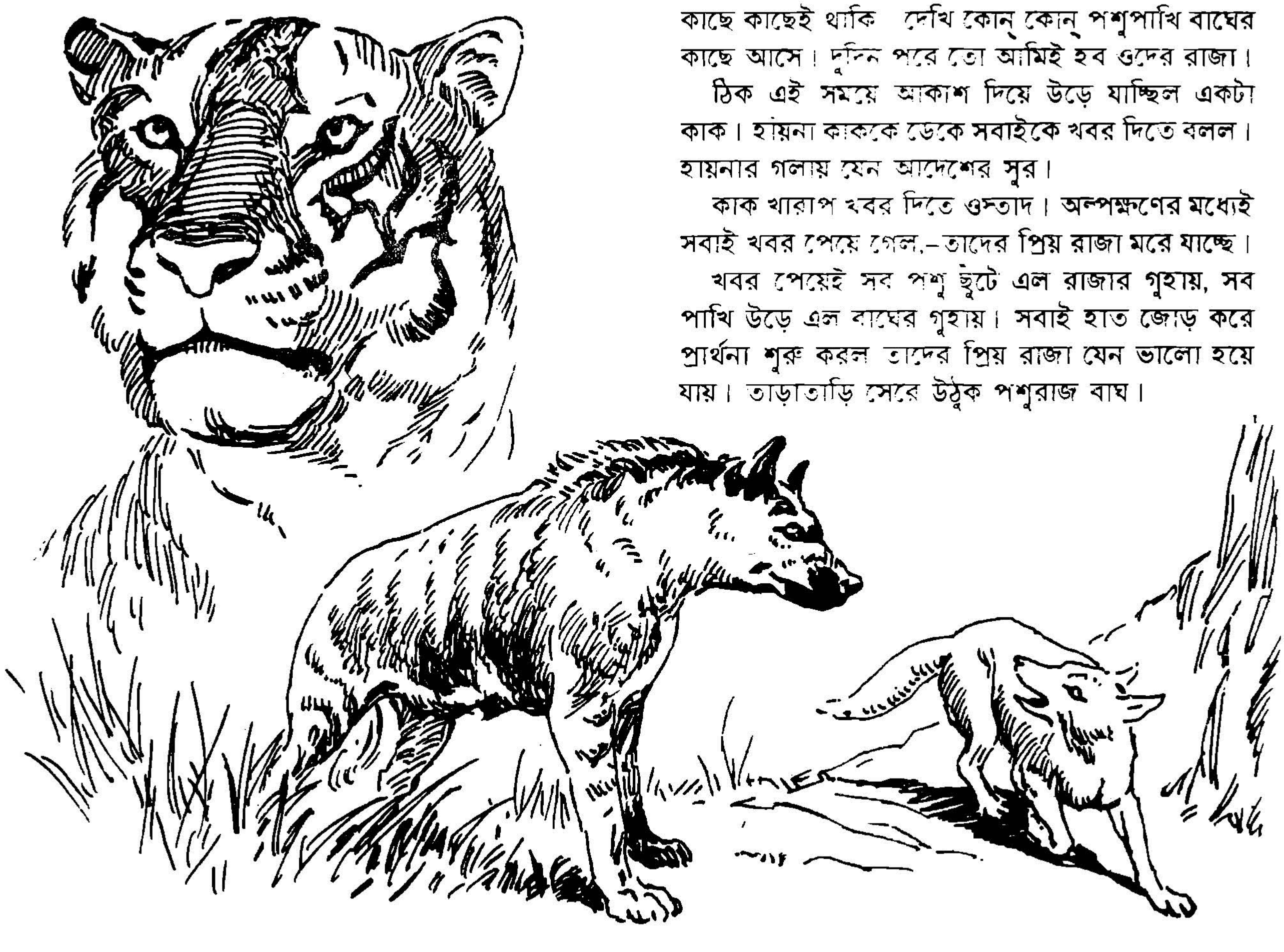

সবাই এল, এল না শুধু শেয়ালেরা। তাদেরও খবর দেওয়া হয়েছে, তবু তারা এল না। দুপুর গড়িয়ে গেল, বিকেল হলো। তবু তারা এল না। রাজার গুহায় যাওয়ার কথা তারা যেন ভুলেই গিয়েছে। সন্ধ্যে হয় হয়। এবার তাদের ভয় হলো। রাজাকে হেলাফেলা করার জন্য যদি শাস্তি পেতে হয়? কী হবে কে জানে? তারা মনমরা হয়ে রইল।

এমন সময় তাদের সর্দার বুড়ো শেয়াল বলল, আরে! ভয়ের কি আছে? বুদ্ধি আছে না? এমন ফন্দি এঁটেছি যে হায়না বুঝবে মজা। লুকিয়ে-চুরিয়ে শেয়াল-ছানা ধরে খাওয়ার মজা এবার টের পাবে। অনেক হয়েছে, আর না। বড্ড বেড়ে গিয়েছে।

কি আর করা? আগে আগে চলল শেয়াল সর্দার, পেছনে পেছনে আর সব শেয়াল। চলল তারা বাঘের গুহার দিকে। পথে যেতে যেতে শেয়াল সর্দার কুড়িয়ে নিল কয়েকটা অজানা গাছের আঁকাবাঁকা শেকড়। শেষকালে গুহায় এল তারা। বাঘ শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে।

শেয়ালদের দেখেই হায়না দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বকুনি দিয়ে উঠল, এত দেরি যে? কোথায় ছিলি সব? আমাদের প্রভুর অসুখ, আগে আসতে পারিস নি? রাজাকে অবহেলা করা?

মনে মনে হায়না ভাবল, বাঘ তো দেখি শুধুই কাতরাচ্ছে মরছে কই? আর কত দেরি করবে মরতে? এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ।

শেয়াল সর্দার দুই হাত জোড় করে নরম গলায় বলল, মহারাজ, আমরা ঠিক সময়েই সব খবর পেয়েছি। আপনার দূত কাকের কোনো দোষ নেই। কিন্তু ইচ্ছে করেই আমরা আসিনি। শুধু শুধু এসে কি হবে? আপনাকে যদি ভালো করে তুলতে না পারি তবে এসে লাভ কি? এসে আপনার কষ্ট দেখে খারাপ লাগত। তাই আপনার অসুখ যাতে ভালো হয় সেই জন্য ওষুধ খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। জঙ্গলে আনাচে-কানাচে খুঁজে খুঁজে শেষকালে ওষুধ পেলাম। অনেক কষ্টে পেয়েছি প্রভু। যাক, এবার অসুখ ভালো হবে। আর চিন্তা নেই।

হায়না ভীষণ মনমরা হয়ে পড়ল, তবু কাঁপা গলায় বলল, তাহলে দেরি করছিস কেন? এক্ষুণি ওষুধ দে।

বাঘ কাতরাতে কাতরাতে বলল, দাও, তাড়াতাড়ি দাও শেয়াল। আর পারছি না।

শেয়াল সর্দার বলল, প্রভু, সাধেই কি এত দেরি হলো? যা যা দরকার সব পেয়েছি। শুধু একটা ওষুধ বাদে।

শিকার করেছে মস্ত একটা হরিণ

হায়না একথা শুনে বেশ খুশি হলো। তবু মুখে বলল, বল, সেটা কী? পশুরা গিয়ে এক্ষুণি খুঁজেপেতে নিয়ে আসবে।

বাঘ বলল, একটা বাকি? তাড়াতাড়ি বলে দাও। হায়না ঠিক ব্যবস্থা করবে।

শেয়াল সর্দার মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, না মহারাজ, ওষুধ সব পেয়েছি। কিন্তু আমাদের ওঝা বলেছে, ওষুধটা খেতে হবে বিশেষ কায়দায়। এই শেকড়ের ওষুধ যখন আপনি খাবেন, তখন চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে খেতে হবে। আর চিৎ হয়ে শুতে হবে একটা হায়নার টাটকা ছালের ওপরে। জ্যান্ত হায়নার ছাল হওয়া চাই, টাটকা চামড়া। অনেক খুঁজলাম প্রভু, বনে হায়না খুঁজে....

বাঘ গর্জে উঠল, এই তো রয়েছে সামনে। অত খোঁজার কি আছে? আমি মরছি ব্যথায়....

বাঘের কথা শেষ হলো না। পশুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল হায়নার ওপর। পেছন থেকে শেয়ালরাও এগিয়ে এল। হায়না আকুল হয়ে কিছু বলতে চাইল। কিছু শোনা গেল না তার কথা। পশুরা ছাড়িয়ে নিল হায়নার টাটকা ছাড়ানো ছাল। গরম ছাল। বাঘ শুয়ে পড়ল ছালের ওপর। চিৎ হয়ে। শেকড়গুলো গিলে ফেলল। সারাদিন কষ্ট পেয়েছে বাঘ, পেটের খাবারও কমে এসেছে। ব্যথা কমে গেল। অসুখ তো আর তেমন কিছু নয়! বাঘ আরাম পেল।

বাড়ির পথে যেতে যেতে শেয়াল সর্দার ফিক্‌ফিক্ করে হাসতে হাসতে বলল, 'বড্ড বাড় বেড়েছিল হায়নার। রোজ রোজ চুরি করে আমাদের ছানা খাওয়া? বাছাধনেরা বোধহয় আর ওসব করতে পারবে না। কি বল?

ছবিঃ প্রসাদ রায়

* ভারতের আদিবাসী (সাঁওতাল) লোককথা।

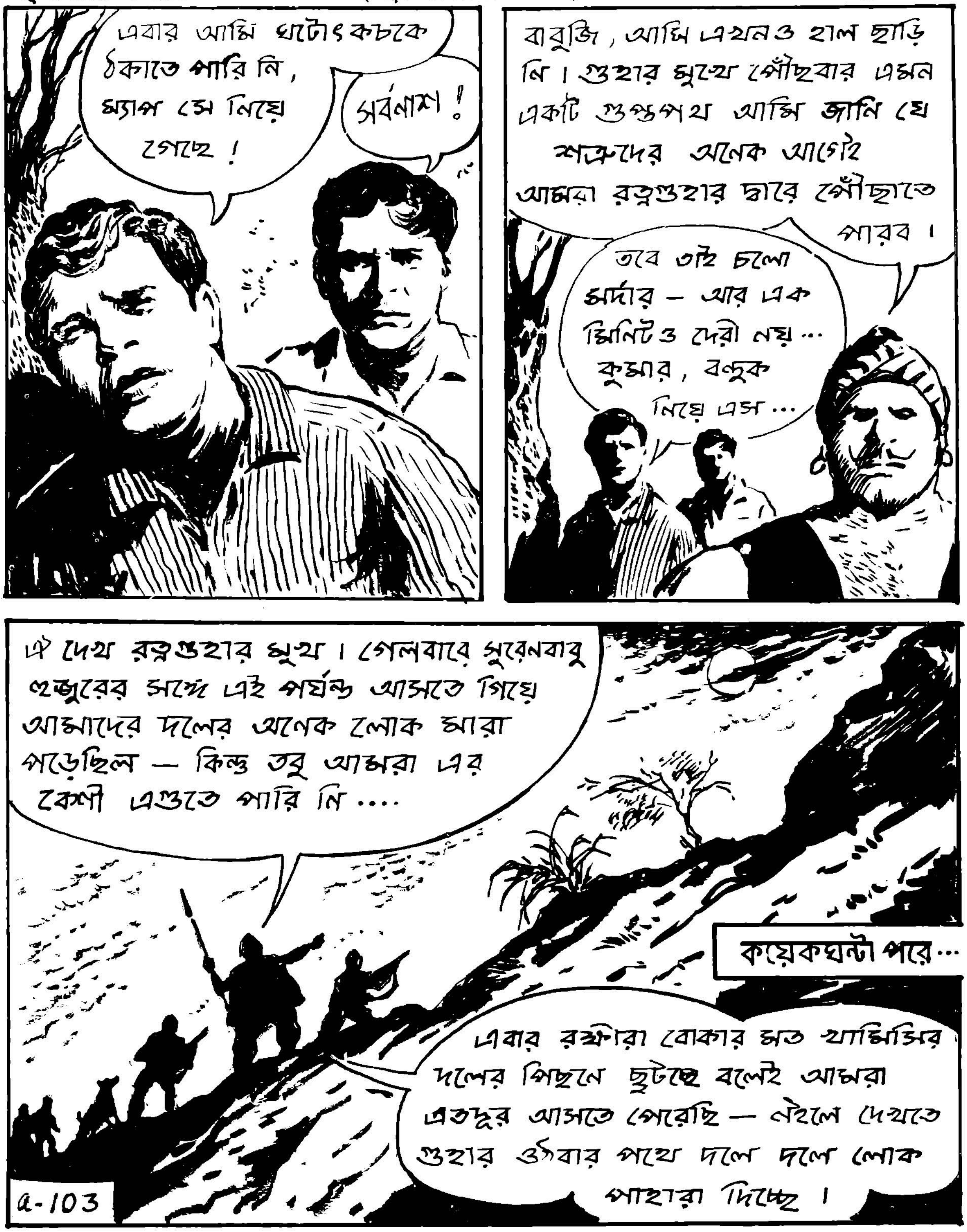
এবার আমি ঘটোৎকচকে ঠকাতে পারি নি, ম্যাপ সে নিয়ে গেছে !
সর্বনাশ !
বাবুজি, আমি এখনও হাল ছাড়ি নি। গুহার মুখে পৌঁছবার এমন একটি গুপ্তপথ আমি জানি যে শত্রুদের অনেক আগেই আমরা রত্নগুহার দ্বারে পৌঁছাতে পারব।
তবে তাই চলো সর্দার — আর এক মিনিটও দেরী নয়... কুমার, বন্দুক নিয়ে এস...
ঐ দেখ রত্নগুহার মুখ। গেলবারে সুরেনবাবু হুজুরের সঙ্গে এই পর্যন্ত আসতে গিয়ে আমাদের দলের অনেক লোক মারা পড়েছিল — কিন্তু তবু আমরা এর বেশী এগুতে পারি নি ....
কয়েকঘন্টা পরে...
এবার রক্ষীরা বোকার মত খাম্সিসির দলের পিছনে ছুটছে বলেই আমরা এতদূর আসতে পেরেছি — নইলে দেখতে গুহার ওঠবার পথে দলে দলে লোক পাহারা দিচ্ছে।
a-103

ঐ যে রত্নগুহার মুখ। বিমলবাবু - এবার আমরা ভেতরে ঢুকব।
টর্চটা জ্বালো সর্দার।
আমার পিছনে পিছনে এসো।
ওকি সর্দার!
a-104

[চলবে]

ট্যান্টর ও টারজন

সব্যসাচী

"উপরে বোংগা, নীচে ডাইন। উপরে বোংগা, নীচে ডাইন।"

পাতালঘরের দরোজায় সান্ত্রী রয়েছে দীর্ঘ বল্লম হাতে। বল্লম সে বাগিয়ে ধরল বটে, ওটা তার কর্তব্যেরই অংগ। কিন্তু বল্লম কার দিকে বাগাচ্ছে তা সে জানে না। কারণ দুই চোখ তার বন্ধ। অত্যন্ত আঁটো করেই বন্ধ। যাতে বোংগার অংগদ্যুতির একটা ঝিলিকও না ঢোকে সে-চোখের পাতা ভেদ করে। ভেদ করলেই ত হয়ে গেল! স্বর্গে চলে যেতে হবে তক্ষুণি।

চোখ বুজে বুজেই টের পেলো সান্ত্রী—কে যেন শক্ত হাতে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে, আর তারপরই মহাডাইনের হুংকার শোনা গেল পাতালঘরের ভিতর থেকে। শোনা গেল আরও একটা আওয়াজ। দরোজায় হুড়কো বন্ধ হ'ল ভিতর থেকে, এ-আওয়াজ তারই।

এটার তাৎপর্য কী হতে পারে?

ভেবে পায় না সান্ত্রী। বোংগাই অবশ্য ত্রিভুবনের অধীশ্বর, এবং মহাডাইনও অবশ্য বোংগারই জলজ্যান্ত প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁদের কী প্রয়োজন যে থাকতে পারে পাতালঘরের মধ্যেকার অন্ধকূপে, বা অন্ধকূপের মধ্যেকার রাজপুত্র সোহাংসুর সংগে, তা ত সান্ত্রী বুঝতে পারছে না! মামুলি আদেশ তার উপর আছে, তা হ'ল এই যে দু'টি মাত্র লোক ছাড়া অন্য কাউকে সে ঢুকতে দেবে না পাতালঘরে। এক, নিজে কোমাংসু, দুই, নিজে হাইনাকুল। তা সেদিক দিয়ে প্রথমেই একটু গাফিলতি সে ক'রে ফেলেছে। ডাইনের সংগে এমন আর একজনকে সে ঢুকতে দিয়েছে, যাঁর ঢুকবার কোন কথা ছিল না। তিনি হচ্ছেন স্বয়ং বোংগা। পরিষ্কার দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ ত পাওয়া গিয়েছেই, তা ছাড়া ডাইন কি নিজেই তারস্বরে চ্যাঁচাননি "উপরে বোংগা, নীচে ডাইন" বলে?

হ্যাঁ। বোংগা ঢুকেছেন পাতালঘরে। তাঁকে ঠেকাবার কোন উপায় সান্ত্রী মাথায় আনতে পারেনি। ঠেকানোর প্রয়োজন ছিল কি ছিল না, সে-বিচারের মালিক সে নয়। প্রয়োজন নয়, কথা হ'ল আদেশ নিয়ে। তার উপরে ছিল এই আদেশ যে কোমাংসু এবং হাইনাকুল ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে—

কিন্তু ঢুকেই যখন গিয়েছে তৃতীয় ব্যক্তি (বোংগাকে

ব্যক্তি বলা উচিত, না অব্যাক্তবলা উচিত, সে-দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসায় যেতে চায় না বাঙ্গোরাদেশের এই নিরক্ষর সান্ত্রী) তখন তার কর্তব্য কী? ঐ সান্ত্রীর? ছুটে গিয়ে কোমাংসুকে খবর দেওয়া? তাতেও অসুবিধা আছে। নিজের স্থান ছেড়ে সে ছোটে কেমন ক'রে? তেমন স্বাধীনতা ত কোন কর্মরত সান্ত্রীর থাকে না!

সাত-পাঁচ ভেবে সে সাব্যস্ত করল, নিশ্চুপ থাকাই তার পক্ষে শ্রেয় হবে এ-সময়। অনর্থ যা ঘটবার, তা ত ঘটেছেই। ঢাকে-ঢোলে তা আর প্রচার ক'রে দরকার নেই। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। তেমন-তেমন দেখলে সে চোঁচা দৌড় দেবে পাঁচিল ডিঙিয়ে। পাঁচিলে-ওঠার মইখানা তার হাতের নাগালেই, ঐ যে! ডাইনের ঘোরাফেরা তুকতাকের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পাঁচিল এখন রক্ষীশূন্যও বটে। সে যদি পালাতে চায়, কেউ আটকাবে না।

ওদিকে ঘরের ভিতরে তখন কী হচ্ছে?

বোঙ্গা আর ডাইন, টারজান আর হাইনাকুল ঢুকে পড়েছে পাতালঘরে। ঘরটা খুব অন্ধকার নয়। এঘরে কোন আলো নেই যদিও, একটা কিছু জোরালো আলো আছে নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোথাও, তারই ছটা এসে পড়েছে এই ঘরের ভিতরেও।

আলোটা কোথায়? আবছা আলোতেও টারজানের শ্যেনদৃষ্টির সমুখে উদ্ঘাটিত হ'ল তার উৎস।

কামরাখানা সার্থকনামা। পাতালঘর ত সত্যিই পাতালঘর। অর্থাৎ পাতালের পথ এই ঘর থেকেই শুরু। কোন্দিকে? ঐ যে নীচুপানে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চৌকো গাঁথনি, দুই ফুট আন্দাজ উঁচু। আড়ে-দীর্ঘে দু দিকেই চার বা সাড়ে চার ফুট। আলোর আভাসটা আসছে সেই ঘেরা-জায়গাটুকুর তলা থেকে।

টারজান এগিয়ে গেল।

আর হাইনাকুল? এতক্ষণে তার কণ্ঠের সেই একঘেয়ে নির্ঘোষ, "উপরে বোঙ্গা, নীচে ডাইন" থেমেছে কিছুক্ষণের জন্য। আর এতক্ষণে সে টেনে ধরল টারজানের হাত।

তাকে উঁচু করে তুলল মাথার উপরে।

ফিসফিসিয়ে বলল—“কোন কথাটি নয়”।

কথা কওয়ার কোন দরকার টারজানের নেই। সে যা দেখবার, তা দেখে নিয়েছে।

হ্যাঁ, এক পলকেই এসব দেখে নিয়েছে টারজান। দেখেও নিয়েছে, নিজের কর্তব্যও স্থির করে ফেলেছে। তার যে-হাত টেনে ধরেছিল হাইনাকুল, এক ঝটকায় তা মুক্ত করে নিয়ে তাই দিয়েই বজ্রমুষ্টিতে সে চেপে ধরল হাইনাকুলের গলা, আর অন্য হাত তার কোমরে দিয়ে তাকে উঁচু করে তুলল মাথার উপরে। পরক্ষণেই তাকে দাঁড় করিয়ে দিল মইয়ের প্রায় মাঝামাঝি একটা ধাপে।

হাইনাকুলের গলার উপর বজ্রপেষণ, কথা কইবার যো নেই তার। টারজান তাকে বলল—“নেমে যাও এক এক ধাপ ক’রে। আমি ধ’রে আছি, প’ড়ে মরবে না তুমি।”

হাইনাকুল সুবোধ বালকের মত নেমে যাচ্ছে নীচে, ধাপে ধাপে। সে বুঝতে পারছে না কিছুই। বোংগার প্রত্যাদেশ ছিল—“যার সংগে তোর দেখা হবে পাঁচিলের নীচে, তার দ্বারায় ভালই হবে তোর।”—এটা তা হলে কোন্ ধরনের ভালোর পূর্বাভাস?

ধাপে ধাপে হাইনাকুল নেমে গেল মেজেতে, ধাপে ধাপে নেমে গেল টারজানও। তারা দু’জন দাঁড়িয়েছে ধরাশায়ী লোকটাকে মাঝে রেখে। টারজানের হাত এখনও হাইনাকুলের গলায়। মানুষ বেশ শক্তপোক্ত বলিষ্ঠই এই মহাডাইন, কিন্তু একবার একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করতে গিয়েই সে বুঝতে পারল সে চেষ্টা বৃথা, এই যে লোকটা তাকে ধরেছে, তার হাত-পাগুলো লোহা দিয়ে তৈরী, রক্তমাংস দিয়ে নয়।

এইবার টারজানের প্রথম কাজ হ’ল, কাঁধ থেকে ঘাসের দড়ি নিয়ে তাই দিয়ে হাইনাকুলের চার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। “একটি কথা কয়েছ কি বোংগার স্বর্গে উঠে গিয়েছ তুমি”—একবার মাত্র তাকে শাসানি দিয়ে রেখেছে টারজান। হাইনাকুল মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে বোংগার এই দূত কথা অনুযায়ী কাজ করতে দ্বিধা করবে না। সে চুপ করেই আছে। এদিকে টারজান—

এই তার পায়ের তলায় ধরাশায়ী দেহটাই যে কংগোরা রাজবংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান, সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারীর, তাও কি আর বুঝতে দেরি হয় টারজানের? সে একবার নাকের নীচে হাত দিল ওর, নিশ্বাস বইছে, অতিক্ষীণ, অতিমৃদু। আর একবার বুকের উপর হাত রাখল ওর, ধুক ধুক করছে বইকি এখনো!

সোহাংসুর পরিধানের লেংটিটা পড়ে আছে নিকটেই। সেটাকে তার কটিতে বেঁধে দিয়ে চোখের পলকে তাকে কাঁধে তুলে ফেলল টারজান। আর এক হাতে তাকে কাঁধের উপর ধরে রেখে অন্য হাতে ধরল মই। ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে সে এইবার ধাপে ধাপে উঠতে লাগল উপরে। নীচে থেকে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ কানে আসছে তার। হাইনাকুল! সে হয়ত কী-না-কী জিজ্ঞাসা করতে চায় বোংগার দূতের কাছে। কথা বেরুচ্ছে না গলা থেকে,

মইয়ের মাথায় পৌঁছোলো টারজান। পাথরের দুই ফুট উঁচু গাঁথনিটাও পেরুলো টারজান। এইবার রুদ্ধ দ্বারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টারজান। একটা আশংকায় হঠাৎ দুরু দুরু ক’রে উঠল টারজানের অন্তর। দোরটা যদি ইতিমধ্যে বাইরে থেকে বন্ধ ক’রে থাকে কেউ? পাঁচ মিনিটের বেশী সময় কাটেনি ডাইন-সহ টারজানের এই ঘরে প্রবেশের পরে। কিন্তু একটা সুস্থ সজ্ঞান মানুষের কর্তব্য স্থির করে নেওয়ার পক্ষে পাঁচ মিনিটই কি যথেষ্ট নয়?

যদি দোর বন্ধ হয়ে থাকে?

চিন্তা বৃথা। আগে নিশ্চিতভাবে বোঝা দরকার যে কী হয়েছে, আর কী হয়নি?

বোঝার সূচনা হিসাবে সে হেঁকে উঠল—“উপরে বোংগা, নীচে ডাইন, উপরে বোংগা, নীচে ডাইন।”

বনে বনে আরণ্য জীবদের সাহচর্যে ঘোরাফেরার কালে অন্য জীবজন্তুর ভাষাও যেমন কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে টারজান, তেমনি শিক্ষা করেছে তাদের কণ্ঠস্বরেরও অনুকরণ করতে। এখন এই সদ্যই সে অন্ততঃ বিশবার শুনেছে হাইনাকুলের উচ্চ কণ্ঠের হুংকার “উপরে বোংগা, নীচে ডাইন। উপরে বোংগা, নীচে ডাইন।” কাজেই পূর্বশিক্ষার কল্যাণে তার কণ্ঠস্বর, নিখুঁতভাবে না হ’লেও, মোটামুটি প্রায় হাইনাকুলের কণ্ঠস্বরের মতই শোনা যাচ্ছে। অন্ততঃ টারজানের নিজের ত তাই মনে হ’ল। ভীত, হতভম্ব, দিশেহারা সান্ত্রীটারও কি তাই মনে হবে না? হবে কি হবে না তারই উপরে নির্ভর করছে টারজানের আর সোহাংসুর নিরাপত্তা, এমন কী জীবনও।

উপরে বোংগা, নীচে ডাইন! কুসংস্কার মানুষের বিচারবুদ্ধিকে এতখানিই কি জড় ক’রে দেয়? সান্ত্রী একবার চোখ না-খুলেছিল, তা নয়। দরোজা যখন ভিতর থেকে বন্ধ হ’ল, আগল পড়ল ওদিকে, তখন সান্ত্রী একবার খুলেছিল চোখ। কিন্তু দরোজার দিকে পিছন ফিরেই সে ছিল এতক্ষণ। মুখটা ঘুরিয়ে যে দরোজাটা দেখে নেবে একবার, সে-সাহস তার হয়নি। কী জানি

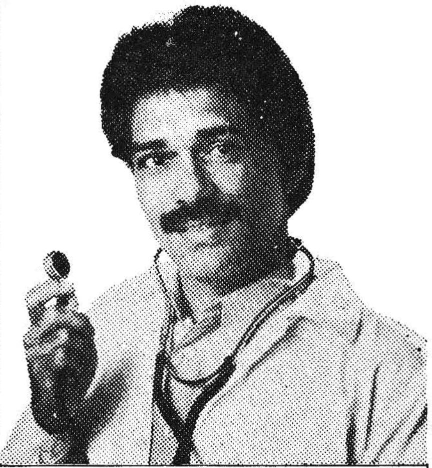

ভিটামিন

আমাদের
সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে
এদের প্রয়োজন
সবচেয়ে বেশি।

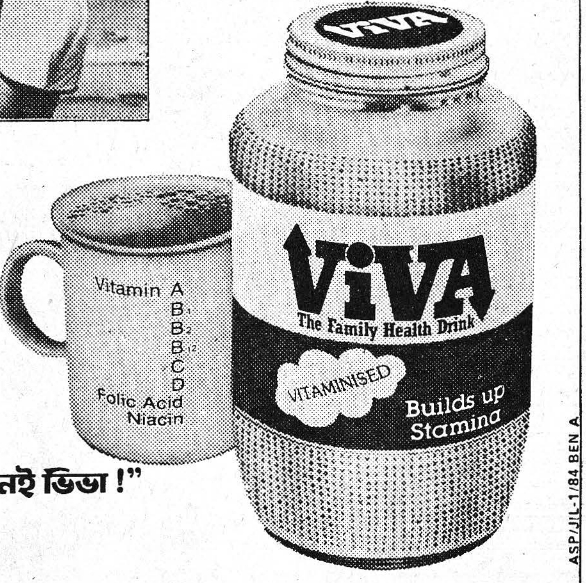

ভিভা ! আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিনে ভরপুর। গম, বার্লির মল্ট ও ক্রীমযুক্ত দুধে তৈরী। ভিভা নিমেষে গুলে যায় এবং সহজে হজম হয়। আর এই সমস্তর যোগফল......

স্ট্যামিনা—যা আপনাকে তরতাজা রাখে।

তাইতো লক্ষ লক্ষ পরিবারের পরম প্রিয় ভিভা। শক্তি ও স্ট্যামিনা যোগায়···সবসময়।

"স্ট্যামিনা বজায় রাখো সদা তোমার তুলনা নেই ভিভা !"

JiL জগৎজিত ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

ASP/JIL-1/84 BEN A

যদিস্যাৎ দরোজার কোন ফাঁক বা ফুটো দিয়ে বোংগার দেহটার একটা ক্ষীণতম রশ্মিও এদিকে এসে ছিটকে পড়ে, সেটা চোখে দেখামাত্রই কি অভাগা সান্ত্রী স্বর্গে চলে যাবে না ? কাজ কী ! যেভাবে আছ, সেভাবেই থাকো। বোংগা-ডাইন জুটি নিজেদের মনে চলে যাক যেখানে খুসী, ও ধীরে সুস্থে চোখ মেলবে তার পরে।

সান্ত্রীর চিন্তাধারা যে খুব সম্ভব এই খাতেই বইবে, টারজান তা অনুমানই করেছিল বইকি! আফ্রিকার বুনোদের মানসিকতার সংগে ত পরিচয় আছে তার ! সে তাই সাহস ক'রে অনেকখানি ভরসা রেখেছে সেই মানসিকতার উপরে। দরোজা খুলে বারান্দায় পা দেবার সংগে সংগে সে হাইনাকুলের গলা নকল করে আবারও হেঁকে উঠেছে "উপরে বোংগা, নীচে ডাইন।" আর সান্ত্রী; আগে থেকেই সে ত বুজেই ছিল দু'চক্ষু। এবারে নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেল একেবারে। টারজান পা বাড়িয়ে ছিল পাঁচিলের দিকে, যেখানে মাটিতে নামানো রয়েছে পাঁচিলে উঠবার কাঠের মই।

হায় একচক্ষু হরিণ ! টারজানের কথাই বলছি। তার দশা এইবার সেই একচক্ষু হরিণের মত। বিপদ যে আসতে পারে, তা সে জানত। তবে এও তার ধারণা ছিল যে আসে যদি বিপদ ত ঐ সান্ত্রীর দিক থেকেই আসবে। ও হঠাৎ সন্দেহবশে চোখ মেলে চাইবে আর সংগে সংগে সব বুজরুকি প্রকাশ হয়ে যাবে টারজানের।

কিন্তু কার্যকালে—

বিপদ এল ঠিকই। কিন্তু ঐ সান্ত্রী তার জন্য দায়ী নয়। দায়ী হ'ল সেই, যার জন্য সিংহের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বসে আছে টারজান। অর্থাৎ সোহাংসু।

সে যে মরে নি, তার একটা প্রমাণ সে হঠাৎই দিয়ে বসল। দিয়ে বসল সে নিজের অজ্ঞাতসারেই। ঠিক সান্ত্রীর পাশ কাটিয়ে পাঁচিলের দিকে দুই পা এগিয়েছে টারজান, এমন সময় তার কাঁধের উপর ঝোলানো হতচেতন মানুষটা—

না, চেতনা সে পায় নি ফিরে। অবচেতন অবস্থাতেই কাৎরে উঠেছে সশব্দে। আর সেই সমূচ্চ কাৎরানি শোনা মাত্র সান্ত্রীটা উঠেছে সজাগ হয়ে। এ-আওয়াজ ত বোংগার বা ডাইনের হওয়া সম্ভব নয়। কার তবে ? কার ? কে উঠল কাৎরে ? কে এল এখানে, স্বর্গে যাওয়ার আতঙ্ককে উপেক্ষা ক'রে ?

ভয়ের কথা তখন আর মনে ছিল না লোকটার। সে চোখ মেলে চাইল যন্ত্রচালিতের মত, আর সংগে সংগে দেখতে পেলো, একটা দীর্ঘদেহ মানুষ পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে ত্বরিত হস্তে মইটা তুলে নিচ্ছে মাটি থেকে, সেটা খাড়া করে দিচ্ছে পাঁচিলের গায়ে।

এ ত বোংগা হতে পারে না ! এ ত ডাইন হাইনাকুলও নয়।

ওর কাঁধে একটা লোক। লোকটা যদি বড় রাজা হয় ? ছোটরাজা গর্দান নেবে আমার"—ভাবল সান্ত্রী। সে ভাবনাচিন্তার ধার দিয়েও গেল না। হাতের বল্লম সাঁ ক'রে ছুঁড়ে মারল। দীর্ঘদেহ মানুষকে তাক ক'রে। সংগে সংগে চীৎকার—"পালায় ! পালায় কয়েদী !"

না, ভাবনা চিন্তাও সে করে নি, তাকটা ঠিক করবার জন্য যত্নও সে নেয়নি। ওদিকে টারজান লম্ফে লম্ফে উঠে যাচ্ছে মই বেয়ে, এক জায়গায় সে দাঁড়িয়ে নেই। বল্লম স্বভাবতঃই লাগল না।

তখন তীর ধনুক। কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে, তূণ থেকে তীর নিয়ে সেই তীর ছুটন্ত শত্রুর উপরে নিক্ষেপ একটু সময়সাপেক্ষ। টারজান ততক্ষণে পাঁচিলের মাথায়।

যাঃ, দড়িগাছা নেই। একহাত দিয়ে মইখানা ওপিঠ থেকে তুলে আনা, এপিঠে নামিয়ে দেওয়াও শক্ত, সময়-সাপেক্ষ। ওদিকে নীচে শোনা যায় দৌড়োদৌড়ির শব্দ, চ্যাঁচামেচির শব্দ। "কয়েদী পালায়, কয়েদী পালায়"—সান্ত্রীর সেই চীৎকারের ফলে সারা রাজভবন সজাগ হয়ে উঠেছে। ধেয়ে আসছে সান্ত্রীর স্বর লক্ষ্য করে।

দু'টো বল্লম এসে ঠং ঠং করে পড়ল নিকটেই। কী করবে টারজান ? একা হলে এতক্ষণ সে লাফিয়ে পড়ত বাইরের মাঠে। কিন্তু একা সে নয়। কাঁধে একটা মরণাপন্ন মানুষ। লাফিয়ে পড়লে তার ঘাড় মটকে যেতে পারে, বুকের ধুকধুকুনি থেমে যেতে পারে। কী করা ? কী করা ? টারজান যে টারজান ! সেও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ওদিকে মই বেয়ে সান্ত্রীরা পাঁচিলে উঠছে।

হঠাৎ পায়ের নীচে মাঠের ভিতর কিচকিচ মৃদু আওয়াজ। ধড়ে প্রাণ এল টারজানের। এ ত কিমো ! কিমো বলছে—"লাফিয়ে পড় বাবা ! দাও লাফ ! দাও লাফ !"

আর তিলমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে, কিমোর স্বর লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ল টারজান, কাঁধে তখনও সোহাংসু।

টারজান পড়ল এসে ট্যান্টরের পিঠে।

একা ট্যান্টর নয়। সারা মাঠে ছড়িয়ে আছে মহাকায় মাতংগেরা, কালো কালো বালিয়াড়ি যেমন থাকে সমুদ্র সৈকতে। টারজানের অভিযানে সাহায্য করবার জন্য ট্যান্টর তাদের ডেকে এনেছে মায়মুনার অরণ্য থেকে।

ছবি : নারায়ণ দেবনাথ

[চলবে]

সেজদাদু বেজায় খুশি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

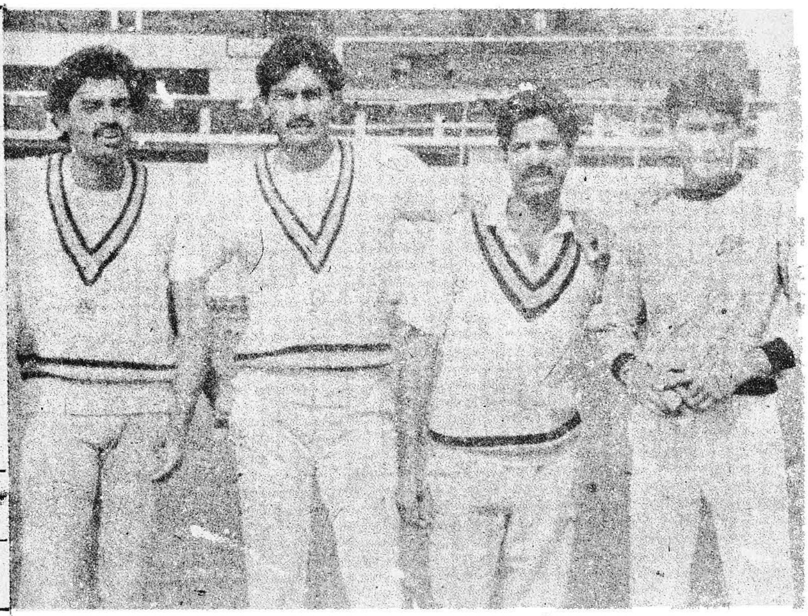

বেংসরকার, রবি শাস্ত্রী, শ্রীকান্ত ও আজহারউদ্দিন।

বিল্টু মন্টুরা দারুণ খুশি। সেজদাদুর মেজাজ এখন ঠান্ডা। মাঝে ফুটবল খেলোয়াড়দের দলবদল নিয়ে একটু চড়া ছিলো। কিন্তু যেই শারজায় ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে রথম্যান ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো অমনি আবার 'দিল খোশ'।

সেজদাদু বলছেন, ফুটবল খেলোয়াড়দের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। দেখলি না প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে কী করলো ওরা। বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্বে ভারত এবারই প্রথম খেললো। কিন্তু একদম সুবিধে করতে পারে নি। কিন্তু ক্রিকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়রা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

রবি শাস্ত্রীকে উৎসাহীর মালা।

১৯৮৩ সালে ইংলন্ডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারত যখন প্রুডেনসিয়াল ট্রফি জিতেছিলো তখন সকলে অবাক হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এ আবার কী হলো! ইংলন্ডের একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় তো বলেই বসলেন, ক্রিকেটের ইতিহাসে ফাঁকতালে জেতার এতবড় নজির আর নেই। অথচ সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দুবার, অস্ট্রেলিয়া, ইংলন্ড আর জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিলো।

১৯৮৪ সালে ভারত শারজায় গিয়ে জিতে এনেছিলো এশীয় কাপ। শারজায় অবশ্য এশিয়ার তিনটি দলই– ভারত, পাকিস্তান আর শ্রীলংকা খেলেছিলো। তারপর এবারের অস্ট্রেলিয়ার বেনসন হেজেস কাপ ও শারজার রথম্যান ক্রিকেট জয় প্রমাণ করেছে যে এক দিনের ক্রিকেটে ভারতই বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় দলের সামনে দাঁড়াবার সামর্থ্য এখন আর কোন দলের নেই।

বিদেশের মাঠে যে ভারতীয় দল এমন দুর্ধর্ষ, অপরাজেয়–সেই দলই কিন্তু দেশের মাটিতে বিশ্রীভাবে হেরে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া আর ইংলন্ডের কাছে। ১৯৮৪ সালে অস্ট্রেলিয়া ভারতে এসে একদিনের খেলাগুলিতে ভারতকে হারানোর পর ইংলন্ড সরকারী সফরে এসে হারালো ভারতকে।

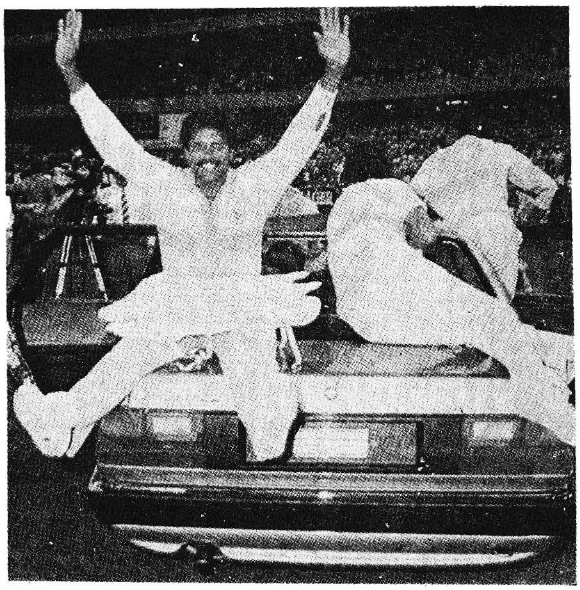

মেলবোর্ণের মাঠে রবি শাস্ত্রীর গাড়ি।
পেছনে দু' হাত তুলে বসে আছেন কপিলদেব।

তাই ভারত এবার যখন অস্ট্রেলিয়ায় বেনসন হেজেস কাপে খেলতে গেল তখন কেউই তেমন পাত্তা দিতে চান নি। সবাই ধরে নিয়েছিলেন, ভারত হেরে ভূত হবে।

অন্যদের এই মনোভাব বুঝতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিশেষ কোন অসুবিধেই হয় নি। তাঁরাও মনে মনে তৈরি হলেন। দলনেতা সুনীল গাভাসকার আর সহনেতা কপিলদেব খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের মতো খেলার জন্যে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মাঠে নামলেন। প্রথম খেলায় ভারত সহজেই হারালো পাকিস্তানকে। দ্বিতীয় খেলায় ইংলণ্ড দাঁড়াতেই পারলো না ভারতের সামনে। বিভাগীয় লীগে পরপর দুটি খেলায় ভারতের অনায়াস জয় চমকে দিয়েছিলো সকলকে। সেই চমক আরও বাড়লো তৃতীয় খেলায় অস্ট্রেলিয়া এবং সেমিফাইনালে নিউজিল্যাণ্ডকে হারানোর পর। অন্য দিকে সেমিফাইনালে প্রতিযোগিতার সব থেকে বড় অঘটন ঘটিয়ে পাকিস্তান হারিয়ে দিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। আর ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত প্রমাণ করলো যে একদিনের ক্রিকেটে ভারতই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

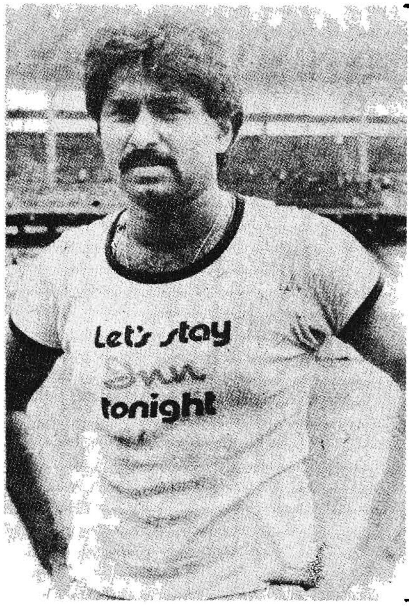

পাকিস্তানের
অধিনায়ক
জাভেদ মিঁয়াদাদ।

সকলেই স্বীকার করেছেন যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মতো ফিল্ডিং আর কোন দল করতে পারে নি। পারে নি ব্যাটিং এবং বোলিংয়েও তেমন দক্ষতার পরিচয় দিতে। সব মিলিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আগাগোড়াই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মতো খেলেছেন।

তার প্রমাণ হলো সব কটি খেলাতেই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন ভারতীয় খেলোয়াড়। দুটি করে খেলায় ঐ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন রবি শাস্ত্রী ও শ্রীকান্ত এবং অন্যটিতে মহম্মদ আজহারউদ্দিন। আর চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নসের পুরস্কার একটি দামি গাড়ি পেয়েছেন ভারতের তরুণ অলরাউণ্ডার রবি শাস্ত্রী।

আরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে। ফাইনাল ছাড়া প্রত্যেকটি খেলায় ভারত প্রতিপক্ষ দলের ইনিংস শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু ভারতকে অলআউট কেউই করতে পারে নি। এও এক মস্ত কৃতিত্বের পরিচয়।

বেনসন হেজেস সোনার কাপটি নিয়ে সুনীল গাভাসকার দেশে ফিরলেন। আগেই ঘোষণা করেছিলেন দলনেতার দায়িত্ব তিনি এবার ছেড়ে দেবেন। বিজয়ীর বেশে তাই করলেন তিনি। তাঁর জায়গায় ফিরে এলেন কপিলদেব। রবি শাস্ত্রী হলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সহ অধিনায়ক।

বেনসন হেজেস কাপ জেতার উনিশ দিনের মাথায় ভারত শারজার রথম্যান ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হলো। যাঁরা বলেছিলেন, ভারত ফাঁকতালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাঁরা এখন একদম চুপ।

সেই জন্যেই তো বিল্টু মন্টুদের সেজদাদু অত খুশি। সেজদাদুর একটা খাতা আছে। তাতে লেখা আছে কোন সাল থেকে ভারত একদিনের ক্রিকেটে খেলছে। কবে ক'টা হেরেছে, ক'টা জিতেছে তাও লেখা আছে তাতে। সেজদাদু খাতাটা ওদের হাতে দিয়ে বললেন, এটা দেখ,

বিশ্ব বিজয়ী ভারতীয় দল

বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—মনোজ প্রভাকর, আজহারউদ্দিন, অশোক মালহোত্রা, শিবরামকৃষ্ণ, রবি শাস্ত্রী, শ্রীকান্ত, গাভাসকার, কপিলদেব ও বেংসরকার,

বসে বাঁদিক থেকে—সদানন্দ বিশ্বনাথ, চেতন শর্মা ও মদনলাল।

তাহলে বুঝতে পারবি ভারতীয় দল কেমন ধীরে ধীরে ভালো থেকে আরও ভালো খেলছে।

ভারতীয় দল এতো ভালো খেলতে পারছে কেন জানিস তো? সকলে মিলে লড়ছেন, দারুণ ফিল্ডিং করছেন, ব্যাটিং, বোলিংও ভালো হচ্ছে। ঠিক মতো ক্যাচ ধরতে পারলে আর ভালো ফিল্ডিং করতে পারলে যে জেতা যায় তার প্রমাণ ভারত দিয়েছে। ক্রিকেট খেলায় একটা কথা আছে—ওয়ান রান সেভড, ওয়ান রান মেড। একদিনের ক্রিকেটে এই কথাটার ভীষণ দাম। তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝেছো।

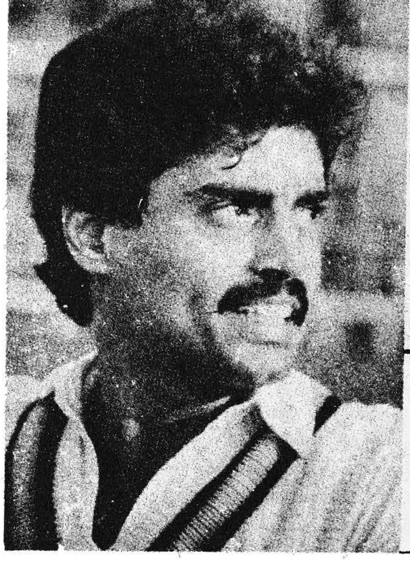

দিলীপ বেংসরকার
ভারতের
নির্ভরযোগ্য
ব্যাটসম্যান

রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংয়ের সঙ্গে বেনসন হেজেস কাপ জয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক গাভাসকার ও ম্যানেজার প্রসন্ন।

এক নজরে একদিনের ক্রিকেট

ভারত একদিনের ক্রিকেট খেলছে ১৯৭৪ সাল থেকে। এই বারো বছরের মধ্যে ভারত একবারই শুধু—১৯৭৭ সালে কোন আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে নি। নিচে প্রত্যেক বছরের জয়-পরাজয়ের হিসেব দেওয়া হলো—

১৯৭৪ সাল— ভারত দুটি ম্যাচ খেলেছে। দুটিতেই হেরেছে।

১৯৭৫ সাল— ভারত তিনটি ম্যাচ খেলেছে। একটি জিতেছে। হেরেছে দুটিতে।

১৯৭৬ সাল— ভারত দুটি ম্যাচ খেলেছে। হেরেছে দুটিতেই।

১৯৭৭ সাল— ভারত কোন ম্যাচ খেলে নি।

১৯৭৮ সাল— ভারত তিনটি ম্যাচ খেলেছে। জিতেছে একটিতে। হেরেছে দুটি ম্যাচে।

১৯৭৯ সাল— ভারত তিনটি ম্যাচ খেলেছে। হেরেছে সবগুলিতেই।

১৯৮০ সাল— ভারত পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে। জয় তিনটিতে। হার দুটি ম্যাচে।

১৯৮১ সাল— ভারত মোট নটি ম্যাচ খেলে। হেরেছে আটটি খেলায়। জিতেছে একটিতে।

১৯৮২ সাল— ভারত মোট নটি ম্যাচ খেলে। জিতেছে পাঁচটি খেলায়। হার চারটিতে।

১৯৮৩ সাল— ভারত মোট উনিশটি ম্যাচ খেলেছে। জিতেছে নটিতে। হেরেছে দশটি ম্যাচে।

১৯৮৪ সাল— ভারত মোট আটটি ম্যাচ খেলেছে। জিতেছে দুটি খেলায়, হেরেছে ছটিতে।

১৯৮৫ সাল— ভারত মোট দশটি ম্যাচ খেলেছে এ পর্যন্ত৭ (রথম্যান পর্যন্ত)। তার মধ্যে জিতেছে আটটি খেলায়, হেরেছে দুটি ম্যাচে।

… যোগ্য ব্যাটসম্যান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত।

বল কনট্রোলের কায়দা

ফুটবল খেলায় বলই আসল। বলকে কেন্দ্র করেই খেলা দানা বেঁধে ওঠে। বল কখনো মাটিতে গড়িয়ে যায়, কখনো শূন্যে ভাসে, কখনো গতি ও দিক পরিবর্তন করে–তবু এই বলকেই নিজের আয়ত্তে আনতে হবে। তুমি যখন বল নিয়ে ছুটছো এবং প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় তোমার দিকে লক্ষ্য রাখছে বা তোমায় বাধা দিতে এগিয়ে আসছে–তখনই তোমার বল কনট্রোলে রাখার ক্ষমতার পরীক্ষা হবে। বল আয়ত্তে রাখার কায়দা যে যতোটা বেশি রপ্ত করতে পেরেছ সেই ততো ভালো খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে।

যে কোন একটা ম্যাচ দেখার সময় একবার হিসেব করে দেখো তো গোল করার কতো সুযোগ দল দুটি নষ্ট করে। খেয়াল করলে দেখতে পাবে, তার বেশির ভাগই হচ্ছে ঐ বল কনট্রোলের অভাবের জন্যে। বল ঠিক মতো আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা নেই বলেই হয়তো খেলোয়াড়টি সুবিধে মতো জায়গায় এসেও গোলে সট নিতে পারে নি। অনেক সময় এমনও হয় যে গোল লক্ষ্য করে মারার মুহূর্তে বল হয়তো খেলোয়াড়টির আয়ত্তের বাইরে চলে গেলো।

সেই জন্যে তোমরা যারা ফুটবল খেলো তাদের সবার আগে বল কনট্রোল বা বল আয়ত্তে রাখার কায়দাটা রপ্ত

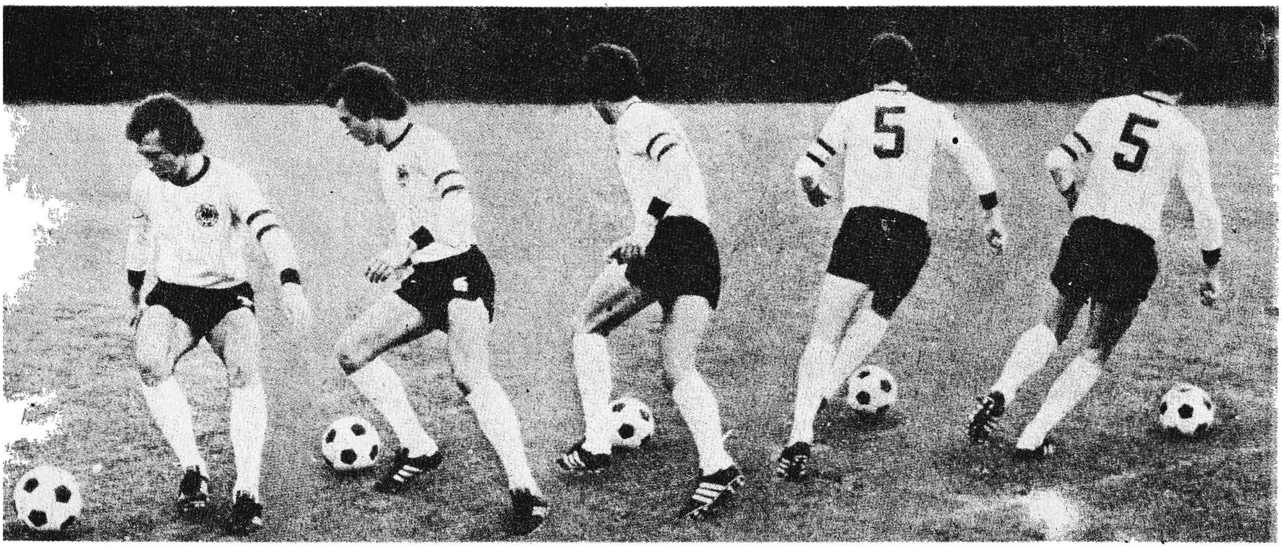

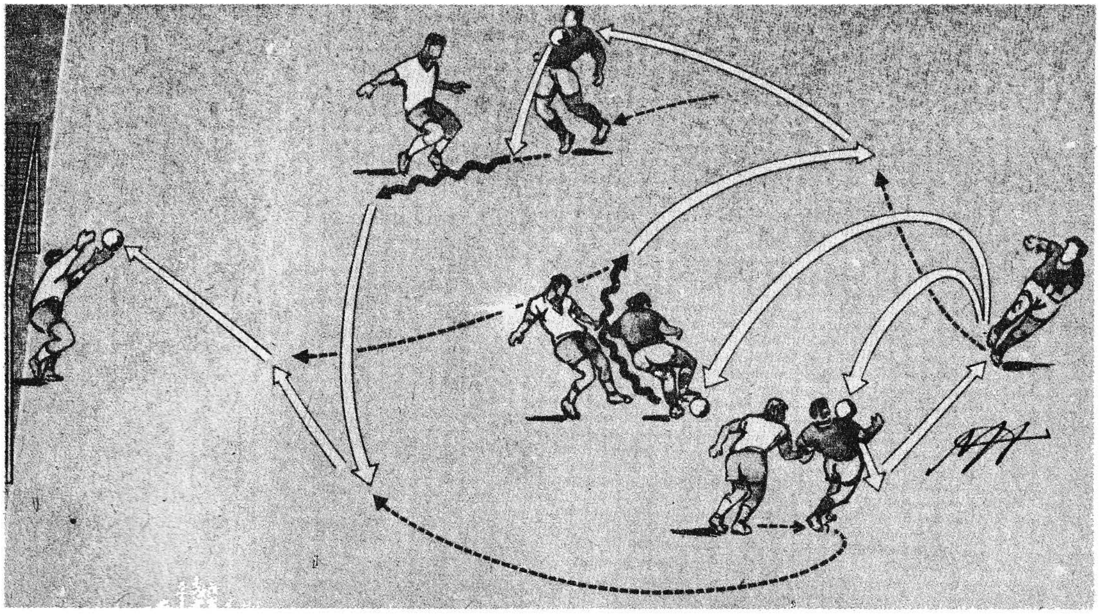

করার দরকার। তার জন্যে অবশ্য খাটতেও হবে। বল চট করে থামানোর কায়দা শিখে সেটি নিজের আয়ত্তে রেখে এগোতে হবে। দিনের পর দিন ধরে বল থামানো, তারপর পায়ে নিয়ে এগিয়ে যাবার প্র্যাকটিশ করতে হবে। ছবিতে দেখো বেকেনবাওয়ারের বল কনট্রোলে আনা, তারপর পায়ে জমিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যাবার কায়দা। তোমরাও ঐ রকম করতে পারবে। তার জন্যে দরকার শুধু অনুশীলনের।

বল কনট্রোলে রাখার ব্যাপারে তিনটি নিয়ম তোমায় মেনে চলতেই হবে–

১) বলের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকো না বা অপেক্ষা করো না। এগিয়ে গিয়ে বলটা ধরো।

২) বল কখনো বারবার মাটিতে পড়ে লাফাতে দেবে না। প্রথম বার মাটিতে পড়ার সংগে সংগে ধরো এবং সেটি নিয়ে এগিয়ে যাও।

৩) বলটা পায়ে আসার সংগে সংগেই ঠিক করে ফেলো তুমি কি করবে–তুমি উঁচু বা নিচু করে পাস দেবে না গোলে সট নেবে। তাহলে অহেতুক সময় নষ্ট হবে না। এক পরিকল্পনা বা লক্ষ্য স্থির করে তবেই বলটা নিয়ে এগোবে।

বল কিভাবে এবং কোনদিক দিয়ে আসছে তার ওপর নির্ভর করবে তুমি কিভাবে বলটা আয়ত্তে আনবে। গড়িয়ে আসা বল তুমি পায়ের 'ইনসাইড অথবা আউটসাইড এজ' দিয়ে কনট্রোল করতে পারো। তোমায় যে বাধা দিতে আসছে তাকে বোকা বানাবার জন্যে বুদ্ধিমানের মতো তুমি বার কয়েক শরীরের মোচড়ও দিতে পারো। মোট কথা, তুমি কি করতে যাচ্ছো তা কিছুতেই তোমার প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে বুঝতে দেবে না।

ড্রপ পড়া বলটা আয়ত্তে আনতে হবে মাটিতে পড়ার সংগে সংগেই। হয় তোমার বুটের বা জুতোর সোল দিয়ে ট্র্যাপ করে বা পায়ের ইনসাইড অথবা আউটসাইড দিয়ে কিংবা উরু নিচু করে বলটা আয়ত্তে আনতে হবে। যে বলগুলো শূন্যে ভাসছে সেগুলিকে সেখান থেকেই কনট্রোলে আনতে হবে। হেড দিয়ে অথবা বুক দিয়ে বলটা ধরে উরুর ওপর ফেলে অথবা সরাসরি নিচে ফেলে বলটা পায়ে আনতে হবে। মাটিতে পড়ার সংগে সংগেই বল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বলটা যেন আর কিছুতেই না লাফায়। বাঁ পাশের পাতার ছবিগুলো দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

একদিনে কিন্তু হবে না। দিনের পর দিন ধরে শিখতে হবে। তখন যদি কেউ দেখিয়ে দেবার থাকেন তাহলে আরও ভালো হয়। প্রথমে অনুশীলনে ব্যাপারটা রপ্ত করতে হবে। তারপর প্র্যাকটিশ ম্যাচে দেখতে হবে কতোটা শিখতে পেরেছো। পারবেই। তার জন্যে চাই প্র্যাকটিশ আর প্র্যাকটিশ। বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় হবার পরও বেকেনবাওয়ার রোজ অনুশীলন করতেন। সেই সময়ই তো এই সব ছবি তোলা।

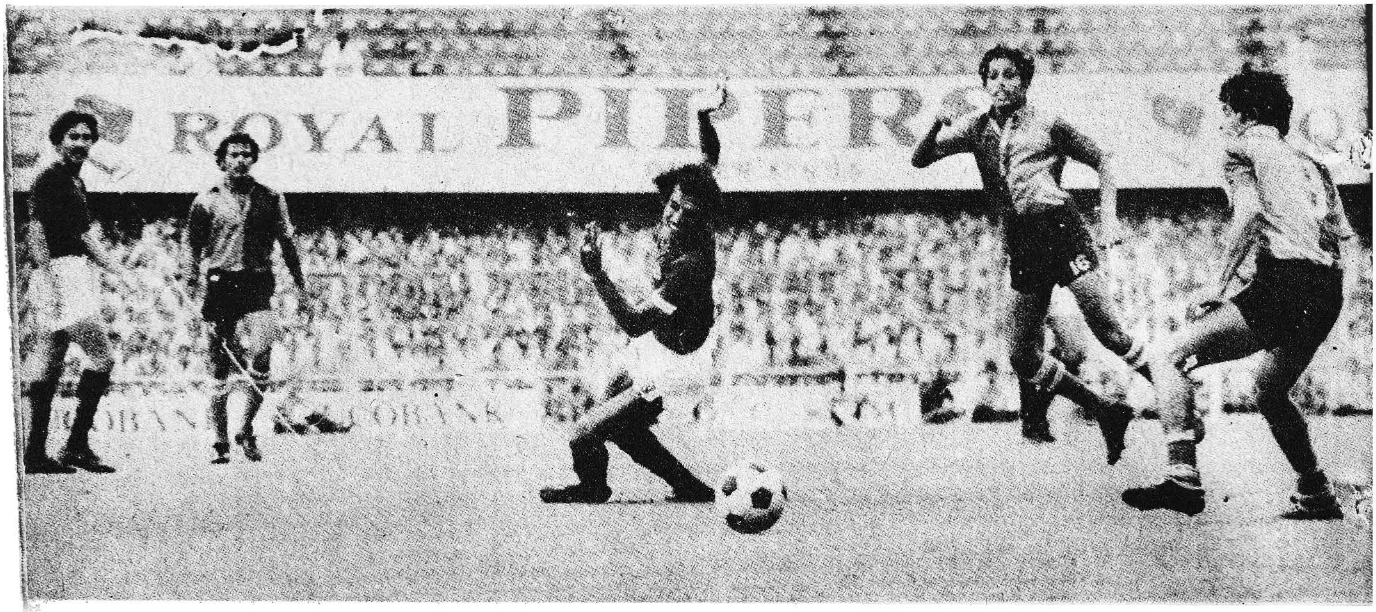

ফুটবলের মরশুম

কলকাতায় এখন ফুটবলের মরশুম। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং মাঠে নামলো বলে। ইস্টবেঙ্গলই এবার সব থেকে শক্তিশালী দল। তবে কলকাতার খেলায় কখন যে কি হয় তা কেউ বলতে পারবে না।

কেউ কি কল্পনাও করতে পেরেছিলো বাংলা সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাবে। কিন্তু হলো তো তাই। পাঞ্জাব এবার বাংলাকে দু দুবার হারিয়ে দিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবই সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলেছে—সেইটাই বোধহয় আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

কিন্তু অবাক লাগে কি ভেবে বলো তো? ফেডারেশন কাপ, রোভার্স, কিংবা ডুরান্ড কাপ—যে খেলাই হোক না কেন—কলকাতার দলগুলো চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে। তাই জাতীয় ফুটবলে বাংলার হেরে যাওয়াটা একটু অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে!

গত বছরের আগের বছর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়েছিলো কলকাতায়। সেবার বাংলা আর গোয়া যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিলো। গতবছর বাংলা সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছিলো পাঞ্জাবের কাছে। আর এবার বাংলা তো কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডিও ডিঙোতে পারে নি।

যাঁরা এবার বাংলা দলে ছিলেন কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদলের সময় কিন্তু তাঁদের নিয়েও আমরা কম মাতামাতি করি নি।

একটা খবর তোমরা জানো কী? এবার থেকে এশিয়ার ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ বলে একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। ভারতের ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ হলো ফেডারেশন কাপ। ফেডারেশন কাপে যে দল চ্যাম্পিয়ন হয় তাদেরই ভারতের সেরা ক্লাবের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতের ঐ সেরা ক্লাবটিই এবার যাবে এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে।

যাই হোক কলকাতার ফুটবল নিয়ে তোমরা এখন নিশ্চয়ই মেতে উঠেছো। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বিল্টু-মন্টুদের সঙ্গে নন্টে-ভন্টেদের ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। এখন তো শুধু হারজিৎ আর ড্র নিয়েই যতো হৈ চৈ।

আর একটা ব্যাপার নিয়ে এখন থেকেই হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ভারত আর পাকিস্তানে হবে। ফাইনাল খেলা হবে কলকাতায়। কলকাতায় অবশ্য আরও একটি খেলা থাকবে। সেই খেলার জন্যে ইডেন এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে। সব থেকে মজার কথা কি জানো? এখন থেকেই কেউ কেউ সেই বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার টিকিটের কথা বলতে শুরু করেছেন।

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে !
সুপার
রিন
सफ़ेदी की चमकार
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেণ্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
LINTAS RIN 90 2418BC

ক্রিকেটের লর্ড ক্লাইভ

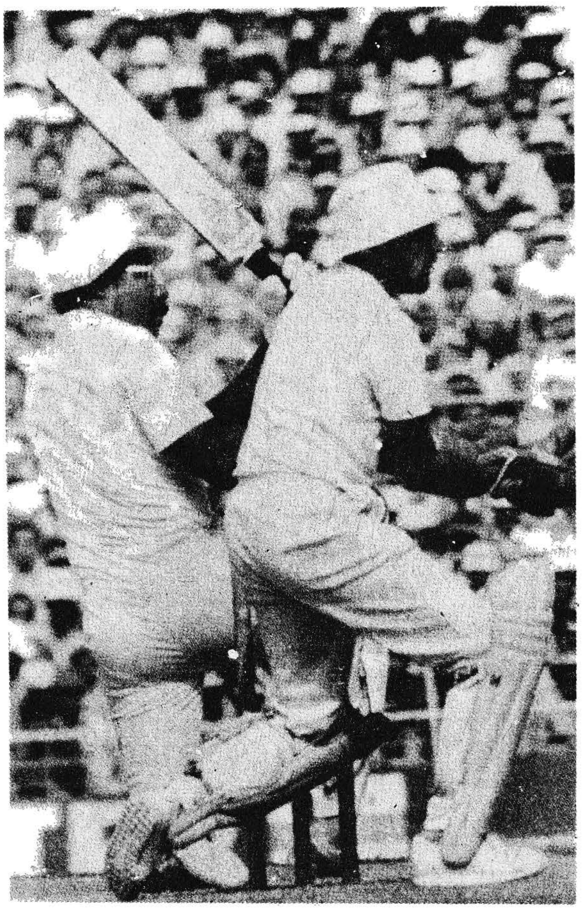

।। এক ।।

বিরক্তিতে হাতের গ্লাভসটা খুলতে খুলতে প্যাভিলিয়নের পথে পা বাড়ালেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড। শেষ বারের মতো পেছন ফিরে দেখে নিলেন মেলবোর্ণের মাঠটাকে। আর কোন দিন এ মাঠে তিনি খেলবেন না। এ মাঠ কেন—কোন মাঠেই তো তাঁর আর আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হবে না। বিদায় নিচ্ছেন মাঠ থেকে। বিদায় জানাচ্ছেন ক্রিকেট খেলাকে।

উইকেট থেকে বাউন্ডারি অনেকটা পথ। আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন লয়েড। দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছেন। বোম্বাইয়ের মাঠে একদিন তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিলো। শেষ হলো মেলবোর্ণে।

ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডে তখন ফুটে উঠেছে বিদায়বাণী।

গুড বাই বিগ ক্যাট। আমরা তোমায় ভুলবো না...

চোখ ফেটে জল আসতে চায়। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। মাথা উঁচু করেই প্যাভিলিয়নে ফিরতে হবে। মন মানে না। ক্রিকেটই তাঁর প্রাণ। ধ্যান, জ্ঞান, আদর্শ। সেই ক্রিকেট খেলা থেকে সরে যাচ্ছেন চিরকালের মতো। এই তো কিছু দিন আগে শেষ টেস্ট খেললেন। এই মেলবোর্ণেই অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক এ্যালান বর্ডারের দলের কাছে বিশ্রীভাবে হেরে যেতে হয়েছিলো তাঁদের। পরপর জেতার বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পরই পরাজয়।

জীবনের শেষ টেস্টে হার। বড় দুঃখের, বড় কষ্টের। জীবনের শেষ টেস্টে জিততে পারলে বড় ভালো হতো। কিন্তু পারে নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ান খেলোয়াড়রা অবশ্য খেলাকে খেলা হিসেবেই নেন। হারলে ভেঙে পড়েন না। কিন্তু জীবনের শেষ টেস্টে হার বড় দুঃখের—অন্তত ক্লাইভ লয়েডের কাছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফলতম অধিনায়ক তো তিনিই।

সেখানেই শেষ নয়। বেনসন হেজেস বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে লয়েডের নেতৃত্বেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলতে গিয়েছিলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ভারতের খেলা দেখে সকলে চমকে উঠেছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সকলেই বিশ্বের এক নম্বর দল বলেন। সকলে বলেছিলেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কেউ যদি রুখতে পারে তাহ'লে সে হলো ভারত।

সকলেই ধরে নিয়েছিলেন বেনসন হেজেস কাপের ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে ভারত। ১৯৮৩ সালে লর্ডস মাঠে প্রুডেনসিয়াল বিশ্ব কাপের ফাইনালে এই দুটি দল খেলেছিলো। ভারত সেবার ক্লাইভ লয়েডের দলকে হারিয়ে একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলো। এবারও কী সেই লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি হবে ?

হলো না। অঘটন ঘটালো পাকিস্তান। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে ভারত ফাইনালে উঠলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু সে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারলো না। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের হার স্বীকার করতে হলো জাভেদ মিঁয়াদাদের পাকিস্তানের কাছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জেতাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও

পারেন নি লয়েড। আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসছেন। মেলবোর্ণ মাঠের হাজার হাজার দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছেন, ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডে ফুটে উঠেছে বিদায় বাণী–

গুড বাই বিগ ক্যাট... আমরা তোমায় ভুলবোনা...

প্যাভিলিয়নে ফিরে চুপ করে বসে আছেন লয়েড। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা জল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে আর কোনদিন খেলবেন না। এই তাঁর শেষ খেলা। জীবনের শেষ টেস্টের সঙ্গে শেষ আন্তর্জাতিক খেলাটিতেও লয়েডের হাতের ব্যাট ঝলসে উঠেছিলো। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। পারেন নি হার রুখতে।

সাজঘরের সোফায় গা এলিয়ে দিলেন লয়েড। খেলোয়াড়ের জীবনে, এ এক করুণ মুহূর্ত। মন মানে না, তবু সরে যেতে হয়। অনেক খেলেছেন লয়েড, চল্লিশের ওপর বয়েস হলো। আর না, এবার বিদায় চাই। নিজের ইচ্ছেতেই লয়েড সরে যাচ্ছেন। তাঁর স্থান নিচ্ছেন আর এক দিকপাল খেলোয়াড় ভিভিয়ান রিচার্ডস। রিচার্ডস পারবে, ভালোভাবেই ক্যারিবিয়ান দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। ভিভের ওপর সে বিশ্বাস তাঁর আছে।

লয়েডের মন বার বার পিছিয়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ছিলো তাঁর প্রথম টেস্ট খেলার কথা। লয়েড সেদিন ভাবতেই পারেন নি–যে তিনি টেস্ট খেলবেন।

কাজ করতেন হাসপাতালে। ভারতে খেলতে যাবার জন্যে মনোনীত হলেন তিনি। কিন্তু হাসপাতাল ছুটি দেবে না। একদিকে চাকরি অন্যদিকে খেলা। গরিব বাড়ির ছেলে। চাকরি ছাড়তে তাই ইচ্ছে করে না। ভাবেন, পরে আবার চাকরি পাবো তো? ওদিকে খেলার টান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতে খেলতে যাবার ডাক। সে আহ্বান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কি তাঁর অছে? নেই। ছেড়ে দিলেন চাকরি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতে গেলেন খেলতে।

মনে পড়ছে ফ্রাঙ্ক ওরেলের কথা। মানুষ তো নন–যেন দেবতা। ওঁর স্বপ্নের মানুষ। বড় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন এই যা দুঃখ। ক্লাইভের মনে পড়ছে ওরেলের কথা।

একদিন তাঁকে আলাদা করে ডেকে ওরেল বলেছিলেন, ক্লাইভ শোন তোমায় আমরা ইচ্ছে করেই ইংলন্ডে নিয়ে যাই নি। জানি তোমার খুব কষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু ইংলন্ডের আবহাওয়া বড় খামখেয়ালি। নতুন খেলোয়াড়দের পক্ষে ঐ পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া রীতিমত কষ্টকর। আমরা চাই নি, জীবনের শুরুতেই তুমি ধাক্কা খাও। তাহলে তোমার মন ভেঙে যেতো। ও ধাক্কা সামলানো সত্যিই কষ্টকর। তোমার ওপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা। তুমি ভারতে যাচ্ছো। নিশ্চয়ই ভালো খেলবে।

তা খেলবে কি করে। চান্স পাওয়াই যে মুশকিল। দারুণ শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঝের সারির ব্যাটিং। কানহাই, বুচার, নার্স আর সোবার্স আছেন। সেখানে লয়েডের মতো একটি নতুন খেলোয়াড়ের স্থান কোথায়?

বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্ট। খেলার দিন সকালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা নেট প্র্যাকটিশ করছেন। লয়েডও আছেন। তিনি জানেন, চান্স পাবেন না। কখনো ব্যাট করছেন, কখনো বল। ওদিকে যে আর এক কান্ড হচ্ছে লয়েড তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না।

সেমুর নার্সের আঙুলে লেগেছিলো। খেলার দিন সকালে ডাক্তারবাবু আঙুল দেখে নার্সকে খেলতে নিষেধ করলেন।

খেলা আরম্ভ হতে তখনো ঘন্টা খানেক দেরি। দর্শকরা আসতে শুরু করেছেন। ওপাশে মনসুর আলি পাতৌদির নেতৃত্বে ভারতীয় খেলোয়াড়রা অনুশীলন করছেন। লয়েড দেখছিলেন সব। হঠাৎ চোখ পড়লো দলনেতা গ্যারি সোবার্সের ওপর। প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে হেঁটে আসছেন নেটের দিকে। লয়েডের মনে হলো ইশারা করে তাঁকে যেন ডাকছেন সোবার্স।

লয়েড তাকালেন। সোবার্স হাতছানি দিয়ে ডাকলেন তাঁকে। লয়েড ছুটে এসে দাঁড়ালেন অধিনায়কের সামনে।

ওয়েস হলের সঙ্গে লয়েড।

বোধহয় কিছু করতে হবে। সোবার্স ওঁর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ক্লাইভ তুমি খেলবে। তৈরি হয়ে নাও।

মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠলেন লয়েড। আনন্দের শিহরন বয়ে গেলো সমস্ত শরীরে। এ তিনি কী শুনছেন। তিনি খেলবেন? ওয়েস্টইন্ডিজের পক্ষে টেস্ট খেলবেন? নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এতোদিন ধরে তো তিনি শুধু এই দিনটির স্বপ্নই দেখে এসেছেন।

আনন্দের পাশাপাশি আশংকার একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো তাঁর শরীরে। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নামছেন, পারবেন তো সফল হতে। না হলেই তো বাদ পড়বেন। তারপর আবার দলে ফিরে আসা রীতিমত মুশকিল হবে।

ভয়, ভাবনা আর আনন্দ মিলেমিশে এক হয়ে গেলো। ক্লাইভ লয়েড ধীর পায়ে প্যাভিলিয়নে চলে গেলেন তৈরি হতে। জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্যে প্রস্তুত হতে।

সেই কথাই মনে পড়ছিল লয়েডের। ক্রিকেটের আসর থেকে সরে যাবার মুহূর্তে বোম্বাইয়ের সেই প্রথম টেস্ট খেলার কথা মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে ছোটবেলার কথা। ব্যাট নেই বল নেই তবু তাঁরা খেলতেন। মনে পড়ছে ওঁর মাসতুতো দাদা ল্যান্স গিবসের কথা। তাঁর খেলোয়াড় জীবনে গিবসের অবদান যথেষ্ট। গিবস ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেরা স্পিনার। টুম্যানের সব থেকে বেশি উইকেট দখলের রেকর্ড ভেংগে দিয়েছিলেন তিনি।

ল্যান্স আজ কতো দূরে। জ্যামাইকা ছেড়ে চলে গেছেন। আমেরিকায় থাকেন। বিদায়ের মুহূর্তে মনে পড়ছে গিবসের কথা। ছোটবেলার খেলার সাথী। বাবা একটা ওষুধের বাক্স এনেছিলেন। সেইটাই হতো তাঁদের উইকেট। একটা তক্তা কেটে বানিয়েছিলেন ব্যাট। আর কাগজ আর ন্যাকড়া জড়িয়ে জড়িয়ে তার ওপর আলকাতরা মাখিয়ে তৈরি হলো বল। তাই নিয়েই কী খেলাই না ওঁদের হতো...

সেই সব কথা মনে পড়ছে ক্লাইভ লয়েডের। বুকের কাছটা টন টন করে ওঠে। গলার কাছে দলা বাঁধা কান্না। ভীষণ কষ্ট হয়ে ক্লাইভ লয়েডের...

[চলবে]

তোমাদের জিজ্ঞাসা

রাজা রায় (এফ. সি. আই. কলোনি, দুর্গাপুর)

প্রশ্ন : কপিল ও মহিন্দর অমরনাথ—কোথায় টেস্ট খেলা শুরু করেছেন? ভারতের মাটিতে মহিন্দরের সব থেকে বেশি রান কতো?

উত্তর : কপিল ১৯৭৮ সালে ফয়সালাবাদে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন।

মহিন্দর ১৯৬৯-৭০ সালে মদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। ভারতের মাটিতে মহিন্দরের সর্বোচ্চ রান হলো ১০১ অপরাজিত। করেছিলেন কানপুরে ১৯৭৮-৭৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।

কাকলী বসু (বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬)

প্রশ্ন : গ্যারি সোবার্সের ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব রেকর্ড গড়ার সময় বাউন্ডারি ইত্যাদি জানতে চাই।

উত্তর : গ্যারি সোবার্স ১৯৫৭-৫৮ সালে জ্যামাইকা টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩৬৫ রান করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। ঐ রান করতে তাঁর সময় লেগেছিল ১০ ঘন্টা ১৪ মিনিট। বাউন্ডারি হাঁকিয়েছিলেন ৩৮টি।

জগন্নাথ বসু (বেলডাংগা)

প্রশ্ন : ভারত ওলিম্পিক ফুটবলে শেষ বার কোন্ সালে খেলে? সেবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক কে ছিলেন?

উত্তর : ১৯৬০ সালে রোম ওলিম্পিকেই ভারত শেষবার ফুটবল খেলেছিলো। পি. কে. ব্যানার্জি ছিলেন সেই দলের অধিনায়ক।

জয় ও রনি বসু (কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা)

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ ফুটবল খেলোয়াড় অর্জুন হয়েছেন?

উত্তর : অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন—

১৯৬১ সালে—পি.কে. ব্যানার্জি
১৯৬২ সালে—বলরাম
১৯৬৩ সালে—চুনী গোস্বামী
১৯৬৪ সালে—জার্নাল সিং
১৯৬৫ সালে—অরুণ ঘোষ
১৯৬৬ সালে—ইউসুফ খান
১৯৬৭ সালে—থংগরাজ
১৯৬৯ সালে—ইন্দার সিং
১৯৭০ সালে—নঈম
১৯৭১ সালে—চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ সিং
১৯৭৩ সালে—মগন সিং
১৯৭৯ সালে—গুরদেব সিং
১৯৮০ সালে—প্রসূন ব্যানার্জি
১৯৮১ সালে—হাবিব
১৯৮২ সালে—সুধীর কর্মকার

আইফেল টাওয়ার

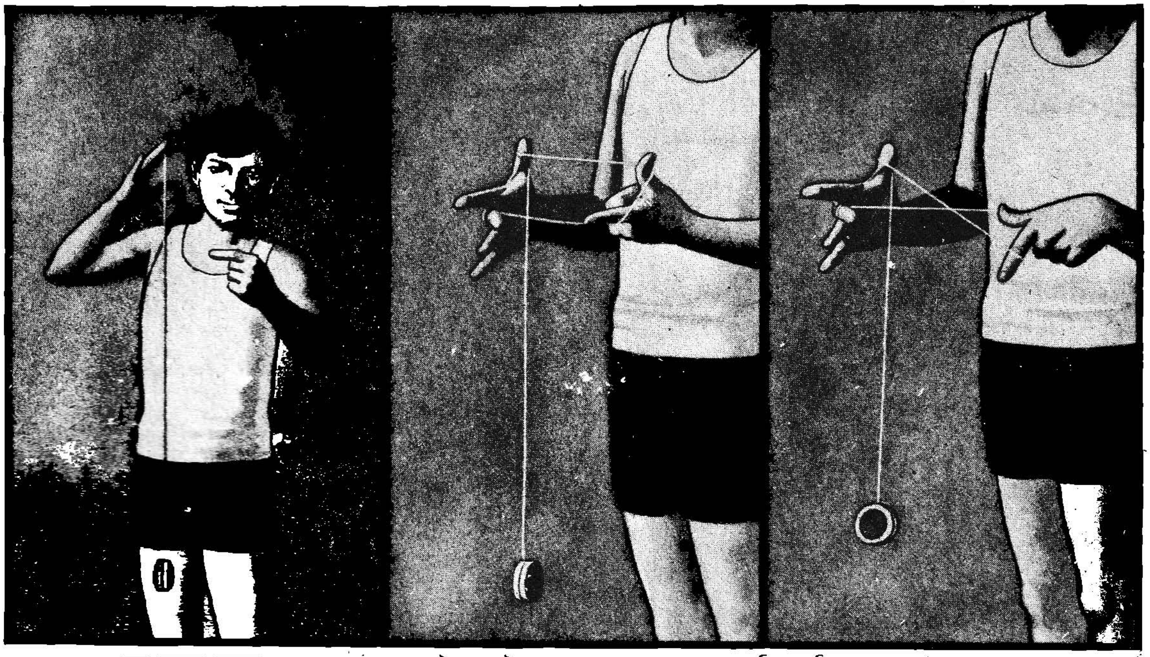

ডান হাতের মধ্যের আঙুলে তোমার হাত লাট্টুর সুতোটা ধরা আছে । এক নম্বর ছবির মতো বাঁ হাতের তর্জনীটা বাড়িয়ে দাও । এবার সুতোটা বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের পাশ দিয়ে নিচে নামিয়ে দাও। বাঁ হাতের আঙুল এবার তৃতীয় ছবির মতো নিচের দিকে নামাও।

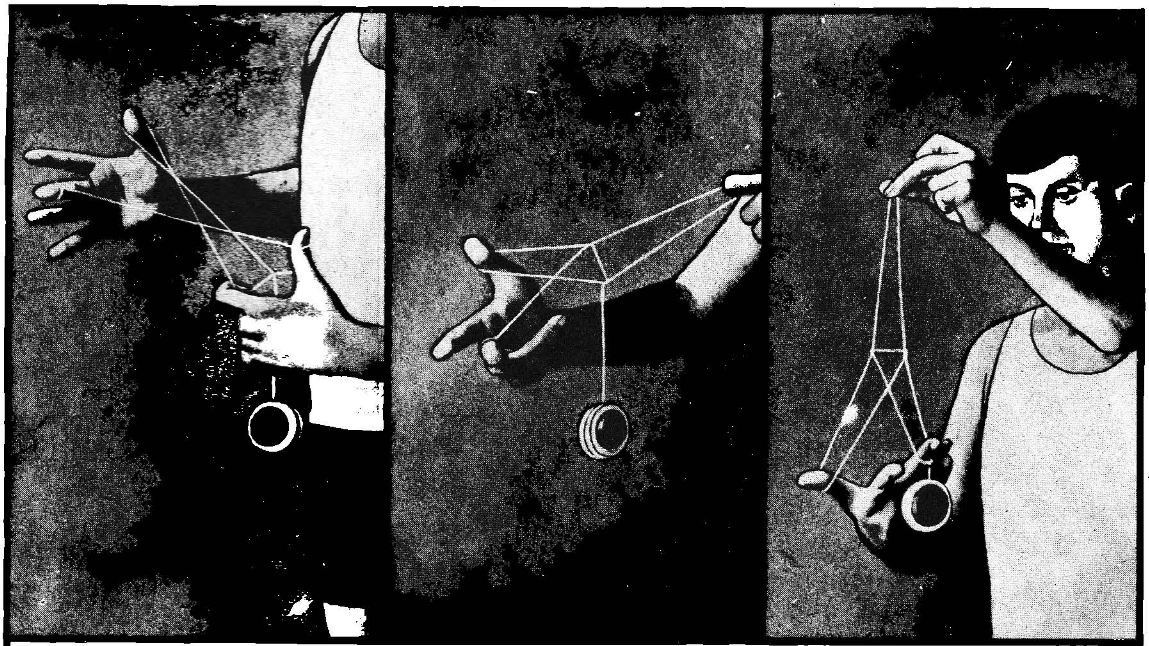

চতুর্থ ছবির মতো করে সুতোটা ঘোরাও। বাঁ হাতের তর্জনী বেঁকিয়ে ছবির মতো করে সুতোটা ধরো। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পঞ্চম ছবিটির মতো করে সুতো টেনে নিয়ে যাও। এবার বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ষষ্ঠ ছবির মতো করে সুতোটা টেনে তোল। সকলকে দেখাও ঠিক যেন আইফেল টাওয়ার।

অলৌকিক

নন্দলাল ভট্টাচার্য

যেমন বাবা, তেমনি ছেলে। বাবা দু বেলায় দশ সের দুধ খান আর সাত বছরের ছেলে জয়রামও তাঁর সংগে পাল্লা দিয়ে দুবেলায় খায় পাঁচ সের দুধ। শুধু কি খাওয়া, চাল-চলন হাবভাব সব কিছুই জয়রামের তার বাবার মত। বাবা করেন গুরুগিরি। জয়রামেরও ইচ্ছে সে বড় হয়ে সবার গুরু হবে, সবাই তাকে মান্য করবে। তার সেই ইচ্ছের কথাটা সেদিন সে প্রকাশও করে ফেললো।

অমৃতসর থেকে 40 মাইল দূরে পূর্ব পাঞ্জাবের লোনাচামারী গ্রাম। সেই গ্রামে থাকে জয়রাম। বাবার যা সামান্য জমি আর গোটা কয়েক মহিষ আছে তাতেই তাদের চলে যায় দিব্যি। এরপর শিষ্য যজমানদের প্রণামী তো আছেই। জয়রাম বাবাকে দেখে আর ভাবে সেও বাবার মত হবে। বাবার মতই সবাই তাকে মান্য করবে। শুধু বাবা নয়, গ্রামে থাকেন যে উদাসী বাবা তাঁকে দেখে ইচ্ছেটা হয় তার আরও প্রবল।

প্রায় রোজই জয়রাম তার মা'র সংগে যায় উদাসী বাবার আখড়ায়। মা'র পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে সাধুবাবাকে আর ভাবে সাধুবাবা কত বড় লোক। কত মানুষ তাঁকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। জয়রাম রোজ দেখে আর ভাবে, তাকেও কি সবাই এমনি করবে। কিন্তু বুঝতে পারে না, কি করলে লোকে এমন ভক্তি করবে। মনে মনে ভাবে, সাধুবাবাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে পথটা।

সেদিন জয়রাম একা একাই যায় সাধুবাবার আখড়ায়। কপাল ভাল। কেউ তখন ছিল না সেখানে। কাছে যেতেই সাধুবাবা তাকে ডাকেন, আও বেটা, কাছে এসো।

জয়রাম এগিয়ে যায় সাধুবাবার কাছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, বল কি খবর?

বাবাজী মহারাজ, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব? বেশ ভয়ে ভয়েই কথাটা বলে জয়রাম। বল, কি জিজ্ঞেস করবে। একটু হেসেই বলেন তিনি।

আমি দেখেছি, বুঝেছি, এই সংসারে আপনিই সবচেয়ে বড়, সবার পূজ্য আপনি। তাই সবাই আপনার কাছে আসে, আপনার কথা শোনে। কি করে আপনি সবার পূজ্য হলেন তার কৌশলটা যদি আমায় বলে দেন তাহলে আমিও সেই পথেই চলব। আমার যে আপনার মত সকলের পূজ্য হতে বড় ইচ্ছে।

সেই পরমহংস সাধুবাবা এবার সকৌতুকে বলেন বেটা সেকথা তো আমিও জানি না। তবে তোমাকে এই কথাটা বলতে পারি, আমি সবসময় পবিত্র রামনাম জপ করি। ওই রামনামই আমাকে ছোট থেকে বড় করেছে। তুমিও মনে মনে ওই মংগলময় রামনাম জপ করো, দেখবে তুমিও এমনি বড় হতে পারবে।

কথাটা শুনেই জয়রাম বেশ দৃঢ়তার সংগেই বললো, আজ এই মুহূর্ত থেকেই রামনাম জপ করতে শুরু করলাম। এমনি করেই আমি দেশবরেণ্য হবো।

সেদিন থেকেই শুরু হল জয়রামের রামনাম জপ। এরি মধ্যে ঘটল আরেকটি অঘটন। জয়রাম তখন বাড়ির কাছেই তাদের মোষগুলি চরাতে নিয়ে যায়। একদিন দুপুর বেলায় মাঠে মোষগুলি ছেড়ে দিয়ে জয়রাম আপন মনে জপ করে চলেছে রামনাম। এমন সময় কোথা থেকে হাজির হলেন এক সন্ন্যাসী। ইয়া লম্বা তাঁর জটা। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। সারা গা দিয়ে যেন জ্যোতি ফেটে বেরুচ্ছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকাই দায়। অথচ দেখলেই তাঁকে ভক্তি করতে ইচ্ছে করে। জয়রাম তাঁকে দেখেই প্রণাম করে।

সাধুবাবা তাকে বলে, বাচ্চা, আমার বড় খিদে পেয়েছে। আমায় কিছু খাওয়াতে পার?

জয়রাম সোৎসাহে বলে, কেন পারব না বাবা, নিশ্চয়ই পারব। আপনি এখানে একটু বসে আমার মোষগুলোকে দেখুন, আমি বাড়ি থেকে আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।

সাধুবাবা বলেন, বেশ আমি দেখছি তোমার মোষ। তাঁর কথা শুনে জয়রাম ছোটে বাড়ির দিকে। বাড়িতে গিয়ে দেখে, বাবা বা মা কেউই নেই বাড়িতে। জয়রাম মনে মনে ভাবে ভালই হয়েছে। বাবা মা থাকলেই তো দিতে হতো হাজার কৈফিয়ৎ। তারপরও তাঁরা দিতেন

কিনা কে জানে। ভাঁড়ার ঘর থেকে একগাদা আটা, ঘি, মিষ্টি নিয়ে জয়রাম ছুটে আসে মাঠে। দেখে, সাধুবাবা তখনও রয়েছেন সেখানে। তাঁকে সেইসব আহারসামগ্রী দিতে পেরে জয়রামের আনন্দ যেন আর ধরে না।

এইটুকু একটা বাচ্চা ছেলের এমন সেবানিষ্ঠা দেখে সাধুবাবা অবাক হয়ে যান। দুহাত তুলে জয়রামকে আশীর্বাদ করেন তিনি, বাচ্চা, তুমি একজন মস্ত যোগীরাজ হবে।

কথাটা শুনে জয়রাম বলে, সেটা কেমন করে হবে বাবা। বাড়িতে আমার বাবা মা আছেন। ঘর দুয়ার, জমি, মোষ রয়েছে আমাদের। আমার বাবার রোজ লাগে দশ সের দুধ, আমারও লাগে পাঁচ সের। আমি কেমন করে যোগীরাজ হবো বাবা?

সেই সাধু বলেন, বাচ্চা, আমার কথা তো মিথ্যে হবার নয়। আমি যখন বলেছি তখন তুমি নিশ্চয়ই যোগীরাজ হবে। কথাটা বলেই তিনি যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি হঠাৎই হলেন অন্তর্হিত।

ওদিকে সাধুর ওই কথাটা শোনার পরই জয়রামের চোখের সামনে যা ছিল সব যেন দুলে ওঠে। সে যেন মুহূর্তে চলে যায় কোন খানে। এই সংসার, বাবা, মা, দাদা, ভাই বোন কারো জন্য তখন তার মন কেমন করে না। সে বুঝতে পারে এই জগৎ, এই সংসার তারজন্য নয়। মুহূর্তে তার মন থেকে অন্তর্হিত হয় মায়া মমতা, জগতের সব বন্ধন তখন খসে যায়। অপূর্ব এক জগতে বিমল আনন্দে সে তখন হাবুডুবু খেতে থাকে । সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পরই তাকে চেপে ধরে ভয়। সে তখন চিৎকার করে বলে ওঠে, সাধুবাবা, এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

চিৎকারের সংগে সংগে চোখ মেলে জয়রাম দেখে, সে বসে আছে সেই মাঠেরই ধারে। রোজকার মতই মোষগুলো চরছে সেখানে। জয়রাম খেয়াল করতে পারে না এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল কিনা। নিজের হাতে আটা, ঘি এসবের দাগ দেখে বুঝতে পারে, না, স্বপ্ন নয়, সব সত্যি।

দিন কাটে। আট বছরের মধ্যেই হয়ে যায় পৈতে। পৈতের পর গুরুগৃহে শুরু হয় পড়াশোনা। অল্প দিনের মধ্যেই সে শিখে ফেলে সবকিছু। গুরুমশাই যখন পড়ান তখন এমন মনপ্রাণ দিয়ে সে সবকিছু শোনে যে নতুন করে তার আর পড়ার কিছু দরকার হয় না। ওই সময় সে চালিয়ে যায় রামনাম।

তার সহপাঠীরা কিন্তু ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখে না। তারা ভাবে জয়রাম বুঝি পড়াতে ফাঁকি দিচ্ছে। তাছাড়া আর সবার মত জয়রাম তাদের সংগে খেলে না এতেও তাদের রাগ। তাই একদিন নালিশ করে তারা গুরুমশাইকে, জয়রাম একদম পড়াশোনা করে না, কেবল ফাঁকি দেয় আর বুঁদ হয়ে ভাবে কিসব।

তাদের কথা শুনে গুরুমশাই ডাকেন জয়রামকে, বলেন, জয়রাম, তুমি নাকি পড়াশোনা কিছুই করছ না?

জয়রাম মাথা নিচু করে বলে, গুরুজী, আপনি যা শিখিয়েছেন তার সবই তো আমি শিখেছি।

বেশ আজ তাহলে আমি তোমার পরীক্ষা নেবো।

নিন, আমি তৈরিই আছি।

ভাল কথা, তাহলে যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন গুরুদেব। আর জয়রাম অনর্গলভাবে বলে যায় তার উত্তর। তার উত্তর শুনে শুধু গুরুজী নয়, জয়রামের সহপাঠীরাও অবাক। দেখে জয়রাম তাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে।

জয়রামের উত্তর শুনে মুগ্ধ হন গুরুদেবও। জয়রামকে আশীর্বাদ করে বলেন, বাবা আমি দেখছি, তুমি তোমার পাঠ তো বটেই, আরো উচ্চস্তরের পাঠও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেছো। মিথ্যে অভিযোগ শুনে তোমার পরীক্ষা নিতে গিয়ে আজ আমারই লাভ হল। তোমার মত ছাত্র পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আজ আমি বুঝতে পারলাম সেই দুর্লভ ভাগ্যের আমি অধিকারী। আশীর্বাদ করি, তুমি মহাপন্ডিত হও।

সেদিন থেকে সহপাঠীরা আর জয়রামকে ঘাঁটাত না। গুরুদেবও আরো যত্ন নিয়ে পড়াতে শুরু করেন জয়রামকে। বছর কয়েকের মধ্যে বহু শাস্ত্র আয়ত্ত করে জয়রাম ঘরে ফেরে।

ছেলেকে পেয়ে বাবা মা'র আনন্দ আর ধরে না। এই অল্পবয়সেই ছেলে তাঁদের মহাপন্ডিত হয়েছে দেখে গর্বে তাঁদের বুক ফুলে ওঠে। ভাবেন, ছেলের লেখাপড়া যখন শেষ হয়েছে তখন এবার বিয়ে দেওয়া যাক।

জয়রাম কিন্তু এবার বাবা মা'র অবাধ্য হয়। বলে, না বিয়ে সে কিছুতেই করবে না। সে দিনরাত রামনাম জপ করছে। ওই মন্ত্রেই সে সিদ্ধ হবে, সাধক হবে।

বাবা আর কি করেন? জয়রামের ছোট ভাইয়ের তাঁরা বিয়ে দেন। ওদিকে জয়রাম এবার গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধ হবে বলে ঠিক করে গ্রামের এক গাছতলায় বসে গায়ত্রী জপ করতে থাকে। একমনে জপ করতে থাকে জয়রাম। একলক্ষ জপ শেষ করার পর সারা আকাশ ভরে গেল আলোয়। সেই আলোর ধারার মধ্যেই আবির্ভূত হলেন দেবী গায়ত্রী। জয়রামকে আশীর্বাদ করে তিনি বলেন সার্থক তোমার তপস্যা। এবার যাও জ্বালামুখীতে। সেইখানে পঁচিশ হাজার জপ করলেই পূর্ণ হবে তোমার মনস্কামনা।

দেবী গায়ত্রীর সেই অমৃতবাণী শুনে ঘর ছাড়লেন জয়রাম।

চলতে চলতে একদিন বনের মাঝেই সাক্ষাৎ পেলেন দেবদাসজী কাঠিয়াবাবার। তাঁর নির্দেশে তপস্যা করে একদিন জয়রাম হলেন সিদ্ধ। ততদিনে তাঁরও নামও হয়েছে বেশ। গুরুর দেওয়া নাম রামদাস নামেই হলেন তিনি পরিচিত। তপস্যা করার সময় গুরু দেবদাস তাঁর কোমরে পরিয়ে দিয়েছিলেন কাঠের এক কোমরবন্ধ আর কৌপীন। উত্তর জীবনেও রামদাস কাঠের ওই কোমরবন্ধ আর কৌপীন পরে থাকতেন বলে সবাই তাঁকে ডাকত রামদাস কাঠিয়া মহারাজ বলে। এক কথায় তিনি কিন্তু সবার কাছে কাঠিয়াবাবা নামেই পরিচিত।

প্রথম শিকার

সুভাষ চৌধুরী

ছোটবেলায় আমি আমার দাদুর কাছে মানুষ। দাদু ছিলেন ইংরাজ আমলের ডাকসাইটে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, রায়বাহাদুর যতীন মিত্তির। ছোটবেলায় ভাল ছেলে বলে আমার সুনাম ছিল না। তাই মা আমাকে দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন; মনে ভরসা ছিল, দাদুর কড়া শাসনে আমি নিশ্চয়ই মানুষ হব।

দাদু তখন নোয়াখালিতে। আমাকে কাছে পেয়ে দাদু-দিদিমা তো খুব খুশি। আমার মামাদের ভেতরে ছোট তিনজন—অশোক, জয়, কাঞ্চন। এরা আমারই প্রায় সমবয়সী—বড়জোর দুই একবছরের এদিক ওদিক হবে। তারা তো আমাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। আমার এক মামা এই জয় মিত্তিরই বর্তমান কালের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রথীন মিত্র।

তিন মামা আর আমি ঘুরে বেড়াতাম বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে। মাছ ধরতাম। কখনো কখনো বট-অশ্বত্থের মগডাল থেকে পাখির ডিম চুরি করতাম। মামাদের ছিল দুটো বন্দুক। একটা ডবল ব্যারেল গান আর একটা 2.2 রাইফেল। এই দুটো হাতিয়ার কাঁধে ফেলে মেঘনার চরে যেতাম পাখি শিকার করতে।

সেই দিনটার কথা আজও বড় বেশি করে মনে পড়ে, যেদিন আমরা চারজন মেজমামার কেয়ার অফ-এ দাদুর শেভরলেটে চেপে ফেণীতে পাখি শিকার করতে বেরুলাম।

মেজমামা গাড়ি ড্রাইভ করছিল। সে-ই আমাদের লিডার।

প্রায় তিরিশ-চল্লিশ মাইল একটানা চলার পর পৌঁছলাম ফেণীতে। চমৎকার শান্ত নিরিবিলি একটা জায়গা। নদীর ধারে ধানক্ষেতের সীমানা ছুঁয়ে শুরু হয়েছে ছোট বড় আম, কাঁঠাল, পিপুল, শিরীষের জংগল।

মেজমামা হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল চেপে সকলকে চুপ করতে বললো, কেমন যেন একটা অদ্ভুত শিহরন! কি জানি জংগল থেকে কী বেরিয়ে আসবে! মেজমামা চুপ করতে বললো কেন? কিছুই চোখে পড়ছে না। শুধু কানে ভেসে আসছে জংগলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের একটানা সাঁই-সাঁই-শব্দ।

মেজমামা বললো, শুনছিস?

চাপাকণ্ঠে বললাম, কী?

ঠিক তেমনি সতর্ক কণ্ঠে মেজমামা বললো, শুনতে পাচ্ছিস না?

বোকার মতন বললাম, না, তো।

তুই না—সত্যি! আয়।

পা টিপে টিপে মেজমামার পেছন পেছন চোরের মতন চারজনে এগোলাম। একটা ছোট ঝোপের কাছাকাছি পৌঁছে তার ইংগিত মত থামলাম।

মেজমামা বললো, ঐ দ্যাখ!

মেজমামা আমার হাতে বন্দুক তুলে দিলে

দেখলাম—একজোড়া বেশ বড় সাইজের ঘুঘু একটা গাছের নিচের দিকে নিচু ডালে বসে আছে। থেকে থেকে গলা ফুলিয়ে ডাকছে—ঘু-ঘু-ঘু-ঘু।

মেজমামা আমার হাতে বন্দুক তুলে দিলে, মার।

মারবো ?

নিশ্চয়ই। দেখিস ফস্কায় না যেন।

বেশ খানিকটা সময় নিয়ে তাক করে ট্রিগার টিপলাম। গুলি ছুটলো এবং সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার একটা ঘুঘু লাট খেয়ে উল্টে পড়লো। আমার তখন কী আনন্দ! যেন বিশ্বজয় করে ফেলেছি। 'মেরেছি-মেরেছি' বলে দু-হাত তুলে চিৎকার করে উঠলাম। অশোক, জয়, কাঞ্চন ছুটে গেল ঘুঘুটাকে খুঁজে আনতে। মেজমামা আমার পিঠ চাপড়ে সহাস্যে বললে , তোর হবে।

নানা ঘটনার টানা-পোড়েনে নোয়াখালিতে কাটলো চার বছর, উনিশ'শ বেয়াল্লিশ অথবা তেতাল্লিশে দাদু কৃষ্ণনগরে এলেন।

ওদের সংগে স্বভাবতই আমিও চলে এলাম তারপর পড়াশুনো, চাকরি–দেবগ্রাম, কালীগঞ্জের হ্যাট ফ্যাকট্রির ল্যায়াসন অফিসার। তখন আমার বয়স কত হবে–বছর কুড়ি-একুশ। মা ইতিমধ্যে গত হয়েছেন,বাবাও মারা গেলেন পঞ্চান্ন সালের ফেব্রুয়ারিতে। কালীগঞ্জ ছেড়ে চলে এলাম কলকাতায়।

আমি তখন বন্ধনহীন। কলকাতা শহরের ইঁট-কাঠ যেন আমাকে চতুর্দিক থেকে চেপে ধরছে। একেবারে মন টিঁকছে না। এমন সময় এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু আলাপ করিয়ে দিলেন আমাকে রাঁচীর কেষ্ট ঘোষের সংগে। পেটানো দোহারা চেহারা। কম কথা বলেন। রাঁচী শহরে একটা মোটর গ্যারেজ আছে। বহু শিকারে অনেকের সংগী হয়েছেন ভদ্রলোক। বললেন, চলুন পালামৌ বেড়িয়ে আসি। ভাল শিকার হবে।

উৎসাহে লাফিয়ে উঠলাম। তাঁর সংগে চলে গেলাম রাঁচী। সেখানে আলাপ হলো আর একজন ভদ্রলোকের সংগে। রোগা ছোট্ট চেহারা সদাই হাসিখুশি। নাম রবি আয়কৎ। সেই প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত সে আমার সমস্ত শিকারের সংগী।

একটা শুভদিন দেখে পালামৌ-র উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। উদ্দেশ্য সেখানকার লাদিগড় এস্টেটে যাওয়া। আমার সংগী রবি আয়কৎ, কেষ্ট ঘোষ আর আমার সদ্য লাইসেন্স পাওয়া বারো বোর ডবল ব্যারেল গান ও থার্টি ও সিক্স স্প্রিং ফিল্ড রাইফেল। কেষ্টবাবুর সংগে লাদিগড়ের কুমার সাহেবের পরিচয় আছে। শিকারের সুবিধা হবে।

গাড়ি ছুটলো সোজা ডালটনগঞ্জের পথে। ডালটনগঞ্জ থেকে বাঁদিকে ঘুরে কোয়েল নদী। নদীতে জল অল্প, জলের নিচে বিছানো টাটারের উপর থেকে অনায়াসেই গাড়ি পার হয়ে যায়। আমিও ফ্যান বেল্ট খুলে জীপ নিয়ে কোয়েল পার হয়ে গেলাম।

সেখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে লাদিগড়। পাহাড় জংগলের বুক চিরে একসময় এসে পৌঁছলাম লাদিগড় রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদ বলতে যে চেহারাটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এটা মোটেই সেরকম কিছু নয়। তবে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাটির দোতলা বাড়ি। অবশ্য তাতেই হাতিশাল আছে, ঘোড়াশাল আছে– বিচারশালা, পূজামণ্ডপ–সবই আছে।

আমাদের ভাগ্য মন্দ–সেখানে কুমার সাহেবের দেখা মিললো না। খবর পাওয়া গেল এখান থেকে মাইল পঁচিশ

NP 007

একমাত্র আসল বাবল গাম

এন.পি. ০০৭ একমাত্র বাবল গাম যা আমদানী করা উপাদান থেকে তৈয়ারী করা হয় এবং গুণমানের বিচারে একমাত্র আই.এস.আই. চিহ্নের অধিকারী।

নকল আর সস্তা, নিকৃষ্ট ধরনের বাবল গাম থেকে সাবধান হোন। এসব স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

দি ন্যাশন্যাল প্রোডাক্টস
বাঙ্গালোর-৫৬০ ০৩২

NP পেয়ে খুশীতে ডগমগ
আর প্রানোচ্ছল হাসি কেউ পারেনা
রোধ করতে।

Dattaram/NP/B 1-85

দূরে পাহাড়, জঙ্গল, নদী ঘেরা জন্তু জানোয়ারে ভরা একটা দুর্গম জায়গা—জায়গাটার নাম পাঁছলেওয়া। সেখানে এদের একটা ভান্ডার আছে। বর্তমানে সেখানেই আছেন কুমার সাহেব—বিহারের সবচেয়ে বড় উৎসব ছট্ উপলক্ষে। খানিকটা হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। কিন্তু ভরসা দিলেন কেষ্টবাবু। বললেন, নার্ভাস হবার কিছু নেই। জায়গাটা আমি চিনি।

অবশেষে পাঁছলেওয়া। সেখানে আমরা যাকে পেলাম—লাদিগড় রাজবংশে তিনি লাল্লুসাহেব নামে পরিচিত—কুমার সাহেবের ছেলে। প্রথম দর্শনে তাঁর প্রতি খানিকটা বিরূপ মনোভাবই জেগে উঠেছিল, কিন্তু পরে দেখেছি ঐরকম বন্ধুবৎসল, সাহসী পুরুষ সত্যিই দুর্লভ।

ভোরের কুয়াশা থাকতে থাকতে লাদিগড় ছেড়ে বেরিয়ে প্রায় দুটোর সময় আমরা পাঁছলেওয়া পৌঁছেছিলাম।

খিদে, তৃষ্ণায় তখন আমরা কাহিল। লাল্লুসাহেব আমাদের লাঞ্চ-এর ব্যবস্থা করলেন, শুকনো খান ছয়েক করে রুটি, অড়হর ডাল আর অদ্ভুত স্বাদের আচারে। পরমানন্দে তিনবন্ধু আমরা তাই গলাধঃকরণ করলাম। থাকার ব্যবস্থা হলো ভান্ডার সংলগ্ন গোয়ালঘরে। দু-তিনটে দেহাতী লোক লাল্লুসাহেবের আদেশে গোবর ময়লা পরিষ্কার করে ঘষে মেজে ঘরটাকে একটু বাসযোগ্য করে তুললো। আমি তো ঘরে ঢুকে হতবাক। একটিও জানালা নেই! রাতে দরজা বন্ধ হলে দম আটকে মরতে হবে যে! রবি বললো, এ ঘরে একমিনিটও বাস করা অসম্ভব। আমরা বাইরেই রাত কাটাবো!

কেষ্টবাবু বললেন, আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু তার জন্য আমাদের একটু কষ্ট করতে হবে।

আমি বললাম, কি রকম?

কেষ্টবাবু বললেন, দিনের বেলা যেমন তেমন, কিন্তু রাতে এদিকেও জানোয়ারদের অবাধ চলাফেরা। অতএব আমাদের একটু সিকিউরিটির দরকার।

সিকিউরিটির ব্যবস্থা হলো। কেষ্টবাবুর অনুরোধে লাল্লুসাহেব কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা শালের খুঁটির গায়ে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে গোয়ালঘরের সামনেটায় চতুর্দিকে ঘিরে একটা বেড়া বেঁধে দিল। চারখানা দড়ির খাটিয়া পাতা হলো তার ভেতরে। ঠিক

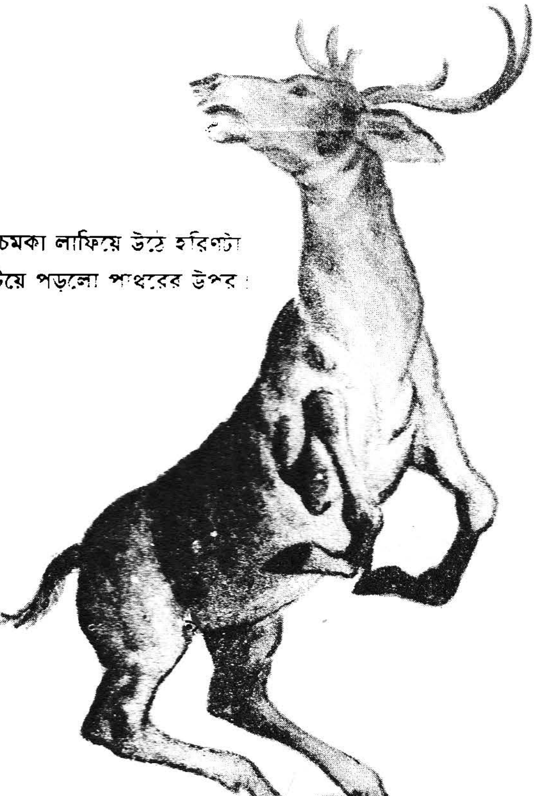

আচমকা লাফিয়ে উঠে হরিণটা লুটিয়ে পড়লো পাথরের উপর।

হলো রাত্রে আমাদের দুজন যখন ঘুমোবে তখন আর একজন জেগে থেকে লোডেড বন্দুক হাতে পাহারা দেবে, তার সঙ্গে পাহারাদার থাকবে লোকাল আরো দুজন। মন্দের ভালো ভেবে সেই ব্যবস্থাটাই তখনকার মতন মেনে নেওয়া গেল।

সূর্য তখন পাটে বসেছে। জঙ্গলের আনাচে কানাচে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে এসেছে কেষ্টবাবু বললেন, গেট রেডি। একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা জলাশয় আছে। এই সময় জানোয়াররা সেখানে জল খেতে আসে।

ব্যস্, মুহূর্তে তিনজন তৈরি হয়ে নিলাম। রাইফেল, বন্দুক, কার্তুজের বেল্ট বেঁধে নিয়ে চল্লাম শিকারের উদ্দেশ্যে।

কেষ্টবাবু নির্দেশিত জায়গাটা ছিল ভান্ডার থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। এ জায়গাটায় জঙ্গল অনেকটা পাতলা। তার মধ্যে রয়েছে এক কাকচক্ষু জলাশয়। সূর্য পাটে নামলেও দিনের আলো তখনো বেশ আছে। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, জলাশয়ের একপাশে খানিকটা ঢাল বেয়ে পায়ে চলা পথের মতো কিছু একটা সৃষ্টি হয়েছে।

কেষ্টবাবু জানালেন, ঐ পথেই জানোয়াররা জল খেতে আসে।

আমরা জলাশয়টার একদিকে বেশ উঁচু একটা জায়গায় আশেপাশের কিছু লতাপাতা তুলে এনে কৃত্রিম ঝোপের সৃষ্টি করলাম আরাম করে রাইফেল বাগিয়ে বসলাম সেই ঝোপের আড়ালে। আমি মাঝখানে, আর দুপাশে রবি ও কেষ্টবাবু। রবি শিকারের আদর্শ সঙ্গী কিন্তু জানোয়ার মারতে ওর ইচ্ছা কম। বন্দুকটা রইলো কেষ্টবাবুর হাতে।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। সেই ছোটবেলায় ঘুঘু শিকারের পর কালীগঞ্জের জমিদারের ছেলের দৌলতে দু-চারটে চখাচখি শিকার করেছি। তারপর দীর্ঘকাল নানা ঝামেলায় ট্রিগারে হাত পড়েনি। আজ এমন সময় এমন পরিবেশে এই জঙ্গল, পাহাড়-ঘেরা অপরিচিত জায়গায় রাইফেল হাতে অদৃশ্য জানোয়ারের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে গুনতে সত্যিই রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। পরবর্তী শিকারী জীবনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গলে হরেক রকমের ভয়ংকর ভয়ংকর জানোয়ারের সঙ্গে মোকাবিলা করেছি; কিন্তু জীবনের প্রথম বড় জানোয়ার শিকারের আশায় অপেক্ষা করার যে শিহরন সেদিন অনুভব করেছিলাম তা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই।

সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলাম—থেমে গেলাম কেষ্টবাবুর ইংগিতে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম একপাল হরিণ নেমেছে জল খেতে।

কেষ্টবাবু ফায়ার করতে বললেন, কিন্তু মন চাইলো না। চুপিচুপি বললাম, একটু পরে—আগে ওরা জল খেয়ে উঠে আসুক।

কেষ্টবাবু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। রবি মুচকি হাসলো।

ততক্ষণে একটা বড় হরিণ উপরে উঠে এসে রাজকীয় মহিমায় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। আমার রাইফেলের নলও তার চলাফেরাকে অনুসরণ করে ঘুরছে।

তারপর—থার্টি ও সিক্স বোরের গুলি ছুটলো। কোথায় গুলিটা লাগলো জানি না, আচমকা লাফিয়ে উঠে হরিণটা লুটিয়ে পড়লো পাথরের উপর। আমি প্রথম বড় শিকারের আনন্দে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম—রবি আর কেষ্টবাবু দুপাশ থেকে জোর করে ধরে আমায় বসিয়ে দিল।

তখন গুলির আওয়াজে হরিণের পালে সাড়া পড়ে গেছে। স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে নিচ থেকে উঠে ওরা জঙ্গলের দিকে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে যাচ্ছে। লক্ষ্য স্থির করে আবার গুলি করলাম; আর একটা পড়লো। সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কেষ্টবাবু বললেন, সাব্বাস! প্রথম দিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।

একটা গোলমালের আওয়াজে রবি পেছন দিকে তাকালো। দেখা গেল, জনা পাঁচেকের একটা দল হৈ হৈ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে বুঝতে পারলাম ওদের হাতে রয়েছে সড়কি, বল্লম।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা কারা?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দলটাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে কেষ্টবাবু বললেন, লাল্লুসাহেবের লোক। বোধহয় উনিই পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যের জন্য।

লোকগুলো এসে পড়লো। কেষ্টবাবুর কথাই ঠিক। বন্দুকের শব্দ পেয়ে লাল্লুসাহেবই ওদের পাঠিয়েছেন। ভালই হলো। ওদের সাহায্যে হরিণ দুটোকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হলো।

সকালের লাঞ্চের কথা ভেবে মনে মনে হাসলাম। রাতের খানাটা জমবে ভালো।

ছবিঃ দিলীপ দাস

ম্যাজিসিয়ান

চন্দ্রভানু ভরদ্বাজ

ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে কিরণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আজই প্রমাণ হয়ে যাবে সত্যি কি মিথ্যে! একেই বলে যোগাযোগ।

কিরণের কথায় ঘরের মধ্যে কিছুটা গুঞ্জন শোনা গেল। রমেশ বললে, সে যেন হবে, কিন্তু তোর যে এত দেরি হলো? আমরা কখন থেকে বসে আছি।

রহস্যমাখানো হাসি হাসতে হাসতে বললে কিরণ—সেজন্যেই তো বলছি—যোগাযোগ। বলে চেঁচিয়ে উঠলো—অতীন ভেতরে আয়।

আবছা অন্ধকারে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকলে একটি ছেলে। দেখতে সুন্দর, ভালো স্বাস্থ্য, অথচ কেমন একটু মেয়েলী মেয়েলী নিরীহ ভাব চোখে মুখে! সাদা শার্ট, কালো ট্রাউজার আর কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ।

কিরণ পরিচয় করিয়ে দিলে, এই হলো সুজিত, রমেশ আর চঞ্চল। আর অতীন, আমার কলেজের বন্ধু।

দুহাত তুলে নমস্কার বিনিময় করে অতীন বললে, আপনারা কেউই তাহলে ভূত কিম্বা প্রেতাত্মার কথা বিশ্বাস করেন না।

সুজিত বললে, আপনি করেন?

করি শুধ নয়, অতীন বললে—এমন প্রমাণ আমি দিতে পারি—কিন্তু তার বোধহয় প্রয়োজন হবে না। সত্যি বলতে কি আমার এখানে আসার কারণ এটাই—কিরণ আমাকে এই রাতের বৈঠকের কথা সবই বলেছে।

আসলে কিরণের কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। ওদের চারজনের আড্ডায় সকলেই সাহসী। ভূত আছে কি নেই—এই তর্কের মীমাংসা হয় নি কোনোদিনই। শেষকালে কিরণই প্রস্তাব দিয়েছিলো, একদিন প্ল্যানচেট করা হোক। সুজিত বলেছিলো, ওটাই তো সবচেয়ে বড় ধাপ্পা। তবু শেষ পর্যন্ত সকলেই রাজি হয়েছিলো। এবং সুজিতের কথা অনুসারে বোসপাড়া থেকে প্রায় মাইলটাক্ দূরে গঙ্গার ধারের এই ভাঙা পোড়ো বাড়িতে গভীর রাত্রে ব্যাপারটা ঘটবে বলে ঠিক হয়েছিলো।

ঘরটা পরিষ্কারকরা হলেও ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভ্যাপসা সোঁদা সোঁদা গন্ধ—ধূপের গন্ধেও সে গন্ধ মরে নি। দেয়ালের প্লাস্টার বহুকাল ঝরে গেছে। নোনাধরা নুড়ি ইঁটের গাঁথনি দাঁত বার করে আছে। জানলার ফাঁক আছে—জানলা নেই। মাথার ওপরে কড়িকাঠ ঝুলে আছে। তবু সারা বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাই আস্ত আছে কিছুটা। অনেক ভেবেচিন্তেই জায়গাটা বেছেছে সুজিত। ভূতের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ।

ঘরের এককোণে টিমটিম করে জ্বলছে একটিমাত্র হ্যারিকেন, তাতে যেন অন্ধকার আরো বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে গঙ্গার ধার থেকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা হাওয়ায় হ্যারিকেনের শিখা দপ্‌দপ্ করে উঠছে।

মাঝখানে জলচৌকিটা রেখে তার চারপাশ ঘিরে ওরা বসে আছে। আরো এক গোছা ধূপ জ্বালিয়ে দিলে কিরণ। কাগজ পেন্সিলটা রাখলে জলচৌকির ঠিক মাঝখানে। বললে, এবার তবে শুরু করা যাক্।

একমুহূর্ত কী যেন ভাবলে অতীন। তারপর বললে, প্ল্যানচেট করবার দরকার নেই। দেখি এমনিতেই আপনাদের কাছে কোনো প্রমাণ রাখতে পারি কিনা।

অবিশ্বাসী, উৎসুক মুখগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে অতীন। আবছা হলদেটে আলোয় ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে লাগলো। অথচ চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। অতীন বললে, আপনারা জানেন না, কলেজের পড়া শেষ করবার পর থেকে বিশেষভাবে এই ব্যাপারে গবেষণা করছি আমি। কলকাতা এবং আশপাশের ভূতুড়ে বাড়ি আমার নখদর্পণে। আমি ওদের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি। কেমন করে তা বলতে পারবো না। কিন্তু আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, সত্যিই আমি বুঝতে পারি।

বলতে বলতে অতীন তার ঝোলা ব্যাগ থেকে এক টুকরো গুটনো ময়লা কাগজ বের করে রাখলে চৌকির ওপর। তারপর মৃদু হেসে বললে, আপনারা ভূত প্রেত বিশ্বাস করেন না যখন, মন্ত্রতন্ত্রও নিশ্চয় বিশ্বাস করেন না। উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে থাকলে অতীন—আমি কিন্তু করি। এই যে কাগজটা দেখছেন, এটা তুলট কাগজে লেখা একটি প্রাচীন পুঁথির অংশ। এটা আমি বহরমপুরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে পেয়েছিলুম। কাগজটা মন্ত্রপূত। এটা পাবার পর থেকে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

সুজিত বললে, কোন কাজ? ভূত খোঁজা, নাকি ভূত দেখা?

তীক্ষ্ণ চোখে সুজিতের দিকে তাকিয়ে বললে অতীন, ঠিকই বলেছেন, দুটোই, তারপর আবার বললে, ভূত মানে আসলে অতীত। আমরা আমাদের অতীতকে ভয় পাই। আমার মনে হয়—

আবার বাধা দিলে সুজিত। বললে, এসব কথায় কী হবে অতীনবাবু! আমরা সকলেই এসব জানি। আপনার যদি সত্যি কিছু দেখাবার থাকে দেখান, নইলে আমরা বাড়ি চলে যাই। বাড়ি গিয়ে ঘুমুলে বরং—

অতীন আবার বড় বড় চোখ তুলে দেখলে সুজিতকে। বললে, বেশ, তাই হোক।

কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বন্ধ করে অতীন চুপ করে রইলে কিছুক্ষণ, যেন ধ্যান করছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডেকে উঠলো কোথাও। সকলেই একটু নড়ে চড়ে বসলে। চোখ খুলে অতীন বললে, এই বাড়িতে আমি এর আগেও এসেছি। আমি জানি এ বাড়ির ইতিহাস। বছরের একটি বিশেষ দিনে এখানে এলে অনেক কিছুই দেখা যায়, শোনা যায়, আপনাদের কাছে যা অবিশ্বাস্য মনে হবে। আজকে অবশ্য সেই দিন নয়। তবু আজো আপনারা যা দেখবেন, প্রমাণ হিসেবে সে-ই যথেষ্ট।

আজ থেকে তিনশো বছর আগে এক নিরীহ নিরপরাধ লোককে কোনো কারণে এই ঘরে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়। তার আত্মা আজো প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। এই কাগজটার ওপর সকলে হাত রাখুন—বলতে বলতে লম্বা কাগজটা অতীন বিছিয়ে দিলে চৌকির ওপর।

একে একে সুজিত, কিরণ, রমেশ আর চঞ্চল সকলেই

সুজিত, কিরণ, রমেশ আর চঞ্চল সকলেই হাত রাখলে কাগজটার ওপর।

হাত রাখলে কাগজটার ওপর। অদ্ভুত পরিবেশের জন্যই হোক বা অতীনের বলার গুণেই হোক—কেউই অতীনের কথা অমান্য করলে না।

নিশুতি অমাবস্যার রাত্রি তার কালো আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে চারদিকে। অবিশ্রাম ঝিঁঝির ডাক আর মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক ভেসে আসছে। কখনো বা দূর থেকে রাতজাগা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। কিছু একটা ঘটবে এমনি প্রতীক্ষায় সকলেই চুপচাপ বসে আছে। অথচ কিছুই ঘটে নি। অধৈর্যভাবে সুজিত বললে, দূর মশাই, কিছুই তো—

চাপা ফ্যাসফেসে গলায় অতীন বললে, চুপ, ঐ দেখুন—বলে আঙুল তুলে ঘরের একটা কোণ দেখালে।

কোথায় একটা খুলে আসা জানলার কবাট বন্ধ হবার শব্দ হলো। সকলে রুদ্ধশ্বাসে ফিরে তাকালে ঘরটার কোণের দিকে। কিরণ ভয়ে ভয়ে একবার নিজের পিছনটা দেখবার চেষ্টা করলে। একরাশ অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলে না।

হু হু করে রাতের গঙ্গার এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ছুটে এলো ঘরের মধ্যে। কে যেন ফুঁ দিয়ে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিলে। কেউই কোন কথা বললে না। শুধু চঞ্চলের গলা শোনা গেল—এই যাঃ!

চাপা ধমকের সুরে কাগজের ঘষটানির মত গলার স্বরে অতীন বললে, চুপ করুন! কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?

ধূপের লাল হয়ে জ্বলা অংশগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে। হঠাৎ সেই কোণের দিকের অন্ধকারের পর্দা যেন দুলে উঠলো। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এলো অন্ধকার। ঘরের মেঝের দিক থেকে যেন কিছুটা কুয়াশা উঠে এলো ওপরের দিকে, মিলিয়ে গেল মিশকালো অন্ধকারে। খুব মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সারা ঘরে, ভ্যাপসা গন্ধ আর ধূপের গন্ধ ছাপিয়ে যেন খুব দামী আতর মেখেছে কেউ। তার ঠিক পরে পরেই সকলের নাকে এলো কদর্য এক কটূ গন্ধ।

ঘরের মধ্যে কারো মুখে কোনো কথা নেই। এই অপার্থিব আশ্চর্য পরিবেশে সকলেই চুপ করে গেছে। সবচেয়ে বড় অবিশ্বাসী সুজিত পর্যন্ত যেন বুঝতে পারছে না কী ঘটছে।

ঠিক এই সময়েই হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরে বহুদূর থেকে কার যেন কান্নার শব্দ ভেসে এলো। কোনো লোক প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদছে। সেই কান্নার শব্দ কমা-বাড়া হতে হতে সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

অদ্ভুত এক ভয় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে চার বন্ধুকে। অতীনের কোনো সাড়া নেই। ওরা এখনো হাত দিয়ে রেখেছে সেই মন্ত্রপূত কাগজটার ওপর। সে হাত ওরা যেন কোনো দিন নাড়তে পারবে না।

ওরা সামনের দিক থেকে চোখও যেন সরাতে পারছে না। ফিকে ধূসর অন্ধকারে ওরা দেখলে সেই কোণের মেঝেটা একটু একটু করে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। সেই ফাঁকের মধ্যে থেকে উঠে আসছে একটুকরো ঘন অন্ধকার। ঘন অন্ধকারটুকু রূপ নিলো এক বিচিত্র বীভৎস মূর্তিতে। যেন একটা কংকালের ওপর শুকনো চিমসে চামড়ার মোড়ক। কোটরাগত চোখদুটোতে দৃষ্টি নেই—সামনের দিকে দুহাত বাড়িয়ে সেই বীভৎস মূর্তি উঠে দাঁড়ালো বাদামী কুয়াশার মধ্যে। আর উৎকট এক ভীষণ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা পোড়ো বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে। সে চিৎকার কোনো মানুষের নয়। অমানুষিক সেই ভয়ানক শব্দ ফিরে ফিরে আসতে লাগলো বার বার।

মূর্তিটা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে এদের দিকেই।

সুজিত সাহসী ঠিকই, কিন্তু এমনি একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে সুজিতের শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে ভয়ের এক ঠাণ্ডা কাঁপুনি নেমে গেল। ওর ঠিক পাশেই বসেছিলো চঞ্চল। চঞ্চলও ভীতু নয়, কিন্তু হঠাৎ অস্ফুটে গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ করে চঞ্চল গড়িয়ে পড়লো মাদুরের ধারে। চিৎকার করে উঠলো রমেশ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল পোড়োবাড়িব সেই ভাঙাঘরে।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে ওরা জানে না। সবচেয়ে আগে নিজেকে সামলাতে পারলো সুজিতই। উঠে বসে পকেট হাতড়ে টর্চটা বার করলে সে। অন্ধকারের পুরু চাদরের তলায় সবকিছু ঢেকে আছে।

গঙ্গার দিকের জানলা দিয়ে একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে বোধহয় মেঘ করেছে। মেঘের দিকে তাকিয়েই সুজিতের মনে পড়লো বীভৎস মূর্তিটার কথা। আরেকবার ওর শরীরটা কেঁপে উঠলো। শরীরের সব শক্তি এক করে টর্চটা জ্বেলে ফেললে সুজিত। চৌকিটা উল্টে গেছে। একপাশে চিৎ হয়ে পড়ে আছে চঞ্চল। অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়, মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে। পাশেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রমেশ। চৌকির আরেকদিকে অতীন বসে আছে ধ্যানস্থ মূর্তির মতো।

এদের দেখে সুজিতের ভয়ের ভাবটা অনেকটা কেটে গেল। টর্চটা ঘুরিয়ে দেখলে সারা ঘরটাই ফাঁকা—কুয়াশাও নেই, সে মূর্তিও নেই, মেঝেতে কোন ফাঁকও নেই। টর্চের আলোয় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কয়েকটা বাদুড় উড়ে বেরিয়ে গেল কড়িকাঠের দিক থেকে। নিশ্চয় ওদের স্থায়ী আস্তানা এটা। দরজার দিকে আলোটা ফেলতেই সুজিত দেখলে কিরণ দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে বসে কাঁপছে থরথর করে। সুজিত উঠে গিয়ে ডাকলে—এ্যাই কিরণ—কিরণ—

প্রচণ্ড ভয়ে কিরণ বোবা হয়ে গেছে। মুখ তুলে তাকালে কিন্তু কোনো কথা বললে না। এতক্ষণে সুজিত পুরো সাহস ফিরে পেয়েছে। কিরণকে ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, ওঠ, ওঠ—ওরা অজ্ঞান হয়ে গেছে! কিরণ সম্বিত ফিরে পেয়ে বললে, কী হয়েছে?

টর্চের আলোয় দেশলাইটা খুঁজে পেয়ে ঘরের কোণে রাখা হ্যারিকেনটা জ্বাললে সুজিত। তারপর বোতল থেকে জল নিয়ে কিছুক্ষণ ঝাপটা দিতেই চঞ্চল আর রমেশের জ্ঞান ফিরে এলো। ওদের হতভম্ব ভাবটা কেটে গেল আস্তে আস্তে।

ততক্ষণে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে চোখ খুলে নড়ে চড়ে বসলে অতীন। মিষ্টি গলায় বললে, আপনাদের এখানে আসাই উচিত হয় নি।

সকলেই অপ্রস্তুত হলো। কোনো উত্তর দিলে না।

অতীন উঠে দাঁড়ালো। বললে, আসল ঘটনাটাই তো আপনারা জানতে পারলেন না–তার আগেই–

চঞ্চল বাধা দিয়ে বললে, আর জানবার দরকার নেই মশাই। খুব হয়েছে।

রমেশ বললে, আমিও। অনেক হয়েছে। এর পরেও দেখবার কিছু ছিলো নাকি অতীনবাবু?

দরজার দিকে এগোতে এগোতে অতীন বললে, নিশ্চয়। দেখবার ছিলো বৈকি।

কিরণ বললে, অতীন, তুই নিজে ভালো মিডিয়াম ছিলিস, একথা জানতুম। কিন্তু এমন ভেল্কি দেখাবি ভাবি নি। ভাগ্যিস ভয় পেয়েছিলুম–নইলে এতক্ষণে ও নিশ্চয় আমাদের ঘাড় মটকে দিতো!

হো হো করে হেসে উঠলে অতীন–দূর–তোরা দেখছি সত্যি ভীতু। আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি, কেউ তোদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে ওরা পোড়োবাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে এলো।

সুজিত এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। এখন মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, সত্যি বলতে কী, ঘরের ভিতরে তখন ভয় পেয়েছিলুম, এখন খোলা আকাশের নিচে একটুও ভয় করছে না।–বলেই হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে অতীনের দিকে ফিরে বললে, গুরুদেব লোক ভাই আপনি, পায়ের ধুলো দিন! শুনেছি,পি সি সরকার এমনিভাবে সম্মোহন করতে পারতেন।আপনি আমাদের মতো চার চারটে জোয়ান ছেলেকে হিপনোটাইজ করে একেবারে শুইয়ে দিলেন? কেন মিথ্যে মিথ্যে ভূতের পিছনে ঘুরছেন–তার থেকে ম্যাজিক শো করলে সারা দেশে নাম ছড়িয়ে পড়তো আপনার!

অতীন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, অতীনকে থামিয়ে দিয়ে কিরণ বললে, ঠিক বলেছো সুজিত। ও কিন্তু সত্যি ম্যাজিক জানে। কলেজে শো-ও করেছিলো একবার।

আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে সুজিত বললে, চেহারা আর কথা বলবার কায়দা দেখেই আমি ধরেছি। এ হিপনোটিজম না হয়েই যায় না। এমন গুণী ছেলের সঙ্গে আগে পরিচয় করাস নি কেন, কিরণ?

কিরণ বললে, খোঁজখবরই তো ছিলো না। আমরা যে এখানে চলে এসেছি তাই অতীন জানতো না। সেই কলেজ ছাড়বার পর এই গত কালকে ওর সঙ্গে দেখা। পাক্কা তিন বছর। ওকে বললাম তোমাদের কথা। ও এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বললে, এ জায়গাটা চেনে–মোটর সাইকেলে আসতে বড়জোর মিনিট কুড়ি লাগবে, সময়মতো পৌঁছে যাবে।

মোটরবাইকে এসেছেন অতীনবাবু, কোথায় রেখেছেন বাইক?

কেমন অন্যমনস্কভাবে অতীন বললে, ব্রেকটা গোলমাল করছিলো, বাইকটা রেখেছি ইঁটখোলার পাশে।

সে কি? এখানে তো জনমানব নেই–বাইকটা খামোকা ওখানে রেখে এলেন কেন?

উপায় ছিলো না। বলে বেশ গম্ভীরভাবে অতীন বললে, আপনি বিশ্বাস করছেন না সুজিতবাবু–আমি কিন্তু আপনাদের সম্মোহন করি নি। যা সত্যি তাই দেখেছেন আপনারা।

দূর–অতীনের কথা একেবারেই উড়িয়ে দিলে সুজিত–কেন মিথ্যে বলছেন? এতো ভালো ম্যাজিসিয়ান আপনি, সেটা স্বীকার করতে আপত্তি কিসের?

ওরা সামনের মোড়টা পেরিয়ে গেল। রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা। মেঘলা আকাশের আলোয় সবকিছু একরকম দেখা যাচ্ছে। আরো বেশ কিছুটা গিয়ে জি টি রোড।

হঠাৎ অনেকগুলো কুকুরের সমবেত ডাকে ওরা সকলেই চমকে উঠলো। একটু দূরে পরিত্যক্ত ইঁটখোলার পাশে পথের ওপর পড়ে থাকা কিছু একটা ঘিরে কুকুরগুলো ডাকছে আর জিনিসটা নিয়ে খামচা-খামচি করছে।

কী বল তো? কিরণ বললে।

সুজিত টর্চটা জ্বেলে ছুটে গেল কুকুরগুলোর দিকে।সুজিতের পিছনে পিছনে বাকি সকলে। মানুষ দেখে কুকুরগুলো সরে গেল। একটা লোক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। লোক নয়–লাশ। জমাটবাঁধা কালচে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে রাস্তার ওপর। কুকুরগুলো অনেক জায়গাতে কামড় বসিয়েছে। রাস্তার ধারে বিশাল অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ির পাশে দোমড়ানো মোচড়ানো একটা মোটরবাইক পড়ে আছে।

একি রে?–বলতে বলতে নিচু হয়ে লাশটাকে উল্টে দিলে সুজিত আর চমকে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে ছিটকে পিছিয়ে এলো। কিরণ দু হাতে মুখ ঢেকে বললে, এ যে অতীন!

অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে থ্যাঁতলানো বাইকটার পাশে দাঁড়িয়ে অতীন হাসছে!

ছবি: তরুণ চক্রবর্তী

মলটোভা দল
পাহাড় চড়ায় দুর্বার চঞ্চল

"মেঘের কোলে রোদ উঠেছে, বাদল গেছে টুটি ...আজ আমাদের ছুটিরে ভাই, আজ আমাদের ছুটি"। ব্যস্‌, পুরো দলটাই ঠিক করে ফেলল, কার্ণালা ফোর্টে পিকনিক করতে যাবে। একই সঙ্গে চড়ুইভাতি আর পাহাড়ে চড়ার মজা। ডাব্বু আর মালতি পিকনিকের ব্যবস্থাপনার ভার নিল। স্যাণ্ডউইচ, আপেল, বিস্কুট, চকোলেটে, বাস্কেট বোঝাই করে আর ঢাউস ফ্লাস্কে ওদের দারুণ প্রিয় সুস্বাদু মলটোভা ভরে ওরা তৈরী।

মিনি কোথায় বেপাত্তা ...

ভোরবেলা সূয্যি ঠাকুর হাসি-হাসি লাল মুখ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মলটোভা দল ফ্লাস্ক ঝুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে পিকনিকে বেরিয়ে পড়ল। কার্ণালা বার্ড স্যাংচুয়ারীতে পৌঁছে ওরা চট্‌পট্‌ ব্রেকফাস্ট সেরে এক-এক কাপ করে সুস্বাদু মলটোভা খেয়ে, পাহাড়ের চড়াই পথে চলল ধেয়ে। দলবল ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলেছে... হঠাৎ দেখে ছোট্ট মিনি দলছুট হয়ে বেপাত্তা! "খোঁজ, খোঁজ" দলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু, মিনির পাত্তা নেই। ভয়ে সবার মুখ শুকনো, চোখে আঁধার দেখতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ ওদের সামনে দেখা দিল ওদের সবার প্রিয় ম্যাজিক হাতি মহাশয়। মিনিকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

"কোথা গেছিলি?...কেন গেছিলি? আমরা খুঁজে-খুঁজে হয়রান"... সবার চেঁচামেচির জবাবে মিনি কোনও রকমে জানালো প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে ও পথ হারিয়ে দল ছুট হয়ে পড়েছিলো। দলের সর্দার ডাব্বু তো মিনিকে আচ্ছা করে বকুনি দিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ভেনু আর সেলিম অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডাব্বুকে ঠাণ্ডা করল। তারপর আবার সবাই চলল পাহাড়ের চূড়ার দিকে।

দিনটা কাটলো সত্যিই চ-ম-ৎ-কা-র!

ওপরে উঠে পিকনিক দারুণ জমে উঠল। কেবল খেলা আর খেলা...আর মুখরোচক খাবার খাওয়া...বড়দের চোখ রাঙ্গানি নেই... একেবারে বাঁধনছেঁড়া আনন্দ। বিকেল বেলা ঘরে ফেরার তাড়া। সবার আগে ওরা আরেক কাপ করে সুস্বাদু মলটোভা খেয়ে নিল তারপর দল বেঁধে পাহাড়ের ঢালু পথে নামতে নামতে মহানন্দে কোরাসে গান ধরল "আমরা বাঁধনছেঁড়া দল...দুর্বার চঞ্চল...মলটোভা দল"

চমৎকার মলটোভা, যারজন্যে সবেতে মজা আর মজা

আজ্ঞে হ্যাঁ, মলটোভায় বাড়ন্ত বাচ্চার দল, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে উচ্ছল। কারণ, প্রতি কাপ মলটোভায় থাকে, সোনালী দানার গম, বার্লি, খাঁটি দুধ, পুষ্টিকর কোকো আর চিনির ভরপুর গুণ। বাচ্চাদের নিয়মিত মলটোভা দিন আর দেখুন, ওরা কেমন বাড়তি প্রাণ-প্রাচুর্যে, রোগ-প্রতিরোধের বাড়তি ক্ষমতা আর দারুণ স্ট্যামিনা নিয়ে সবল স্বাস্থ্যে তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। মলটোভা... আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাদের প্রাণ-প্রাচুর্যের খনি।

মজার মলটোভা ক্লাবে যোগ দাও!

যোগ দেয়া খুবই সোজা! কেবল এর ৫০০ গ্রামের শিশির তিনটি লেবেল ও ভেতরের সীল বা ৫০০ গ্রাম রিফিল প্যাকের তিনটি ওপরের ফ্ল্যাপ এখানে পাঠিয়ে দাও:

দি মলটোভা ক্লাব
৪-র্থ তলা, নেহেরু প্লেস
নিউ দিল্লী ১১০০১৯।

ব্যস, তুমি দলে ঢুকে পড়লে।

JiL জগৎজিত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

ভিটামিনে ভরপুর মলটোভা: স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের জন্যে

SIMOES/JIL/001/84 BEN/R

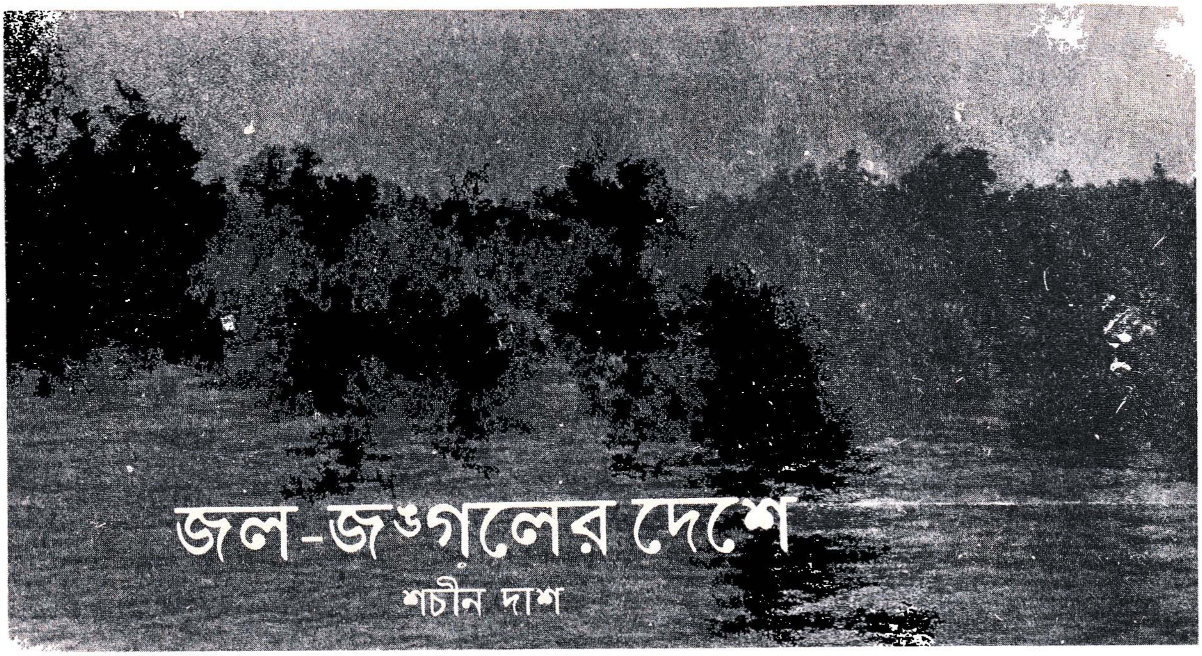

জল-জংগলের দেশে

শচীন দাশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাঁটতে হাঁটতে বাঁধের ওপর দিয়ে এগোচ্ছিল হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল পিংকি। জলের ওপরে যেন সাজানো গোছানো ঘরবাড়ি নিয়ে কতগুলো নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। কাছেপিঠে অনেক লোকজন ভিড়। তার ভেতরেই দু'তিনটে লঞ্চ দাঁড়িয়ে।

–চল ওটা যাবে। ওই যে 'বনমাতা'।

পিংকি দেখলো, সামনে যে লঞ্চটা দাঁড়িয়ে আছে তারই গায়ে ইংরেজি ও বাংলায় আলাদা আলাদা করে লেখা 'বনমাতা'। ওটার কথাই তাহলে কুট্টিমামা বললো।

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। সময় হতেই লঞ্চের ঘন্টি বেজে উঠলো। তারপর জেটি থেকে তক্তাটা তুলে নিতেই লঞ্চ চলতে শুরু করলো। আর মিনিট পনেরোর ভেতরেই লঞ্চঘাটের কোলাহল ছেড়ে 'বনমাতা' গিয়ে পড়লো মাঝ দরিয়ায়।

প্রায় সাড়ে-দশটা নাগাদ লঞ্চ এসে দাঁড়ালো বাসন্তিতে। নদী এখানে সরু। মাতলা থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্যা নাম নিয়ে চলে গেছে সোজা পুবের দিকে।

মিনিট চারেক দাঁড়িয়ে লঞ্চ আবার চলতে শুরু করলো। আর সবে ঘুরে পুবমুখী হয়েছে এমন সময় একটি লোক উঠে এসে পিংকিদের পাশে বসা আর একটি লোককে ডাকলো, এই যে নোনাদা কোথায় গিয়েছিলে?

নোনাদা নামের লোকটি একবার সামনে তাকিয়ে প্রশ্ন-কর্তাকে দেখেই এক গাল হেসে ফেললো।

–গিয়েছিলাম মেয়ের শ্বশুরবাড়ি–অই সোনাখালি। দিন পাঁচেক থেকে এই ফিরতিছি।

–এদিকের খবর শুনিছো?

–কী....কী খবর বল তো!

লোকটি বলল, সুবল দাস মারা গেছে।

–অ্যাঁ....সে কিরে!

নোনাদা-র মুখের বিস্ময় কাটতে না কাটতেই লোকটি জানাল, হ্যাঁ। পিরখালির জংগলে গিয়েছিল পরশুদিন। জ্বালানী আনতে। বাস ওখানেই খতম। বউটা খুব কাঁদতিছে।

খবরটা মন দিয়ে শুনছিল পিংকি। ওদের কথার মাঝখানেই ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসলো, কি হয়েছিল ওই সুবল দাসের!

ততক্ষণে দেবাঞ্জনও এগিয়ে এসেছে। ওদের কথাগুলো ওর কানেও গিয়েছিল। কিন্তু সুবল দাস নামের লোকটির মৃত্যু-রহস্য ঠিক পরিষ্কার হয়নি। এখন জিজ্ঞেস করতেই জানলো, লোকটি বাঘের কবলে পড়েছিল। সেদিন সকালেই সজনেখালির ফরেস্ট-অফিসে গিয়ে সে প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র নিয়ে পিরখালি ব্লকের ২ নং কম্পার্টমেণ্টে যায় জ্বালানী সংগ্রহ করতে। খালের পাড়ে ডিঙি রেখে সে ঢোকে জংগলের ভেতরে। সংগে ছিল আরও দু'জন–বিবেক দাস ও সুশীল দাস। কিন্তু জ্বালানী সংগ্রহ করে একটু পরে তারা ফিরে আসার মুখেই পেছন থেকে প্রথমে একটা 'আঁক' করে ওঠার শব্দ পায় বিবেক দাস। সংগে সংগে পেছনে ফিরে

দেখে সুবল দাসের ঘাড় কামড়ে ধরে তাকে নিয়ে পালাচ্ছে প্রকান্ড একটা ডোরাকাটা। মুহূর্তেই সুশীলকে দেখিয়ে বিবেকের গলা চিরে চিৎকার বেরোতে থাকে। সুশীলও চেঁচায়। হাতের লাঠি দিয়ে দুজনেই আশেপাশে গাছের গায়ে বাড়ি মারতে থাকে। ও একটু পরে দৌড়ে যায়। এদিকে এসব চিৎকার ও হইচইয়ে বাঘটা হঠাৎ সুবল দাসকে ফেলে পালিয়ে যায়। এই সুযোগে বিবেক আর সুশীল ধরাধরি করে মৃত সুবলকে নিয়ে এসে ডিঙিতে তোলে। আর সেই সময়েই বাঘটা আবার দৌড়ে আসে। বিবেকদের ডিঙি ততক্ষণে ভেসে পড়েছে। তবুও নদীর ধার ধরে ধরে বাঘটা কিছুক্ষণ ওদের অনুসরণ করে। তারপরে আর ধরা সম্ভব নয় জেনে আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যায়।

কুট্টিমামাই পিংকির মাথায় হাত রেখে বললো, ওই দ্যাখ পিংকি গোসাবার লঞ্চ-ঘাট। আমরা এসে গেছি।

পিংকি উঠে দাঁড়াল। লঞ্চ-ঘাটের দুধারে—নদীর জলের ধার ঘেঁষে জঙ্গল। বাণী, হেঁতাল, পশুর, গরাণ আর বন-ঝাউ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। তারই ওপাশে মাটির উঁচু বাঁধ। তবে বাঁধের ওপর দিয়ে যাতায়াতের জন্য ইট দিয়ে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।

সে রাস্তায় উঠতেই দু'জন লোক ছুটতে ছুটতে এসে কুট্টিমামাকে ধরলো।

—আরে নন্দুদা, না দেখেই চলে যাচ্ছেন?

কুট্টিমামা ফিরেই হাসলো, এই দেখ—আমার তো চোখেই পড়লো না। কোথায় ছিলেন? আমি ভাবলাম, বুঝি আমার খবরই পাননি।

—না-না খবর পৌঁছে গেছে। চলুন—চলুন—

বলতে বলতে পিংকির দিকে তাকিয়ে লোকদুটির একজন জিজ্ঞেস করল, এটি আপনার ভাগ্নে বুঝি? যার কথা লিখেছিলেন?

—হ্যাঁ—কুট্টিমামা জবাব দিল, এটি আমার ভাগ্নে পিনাকি আর এরা দু'জন আমার বন্ধু দেবাঞ্জন আর তড়িৎ। দুজনেই স্টেটব্যাঙ্কে চাকরি করে। সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে ঘোরে।

লোক দুজনের, যে কথা বলছিল সে দেবাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে জানালো, এখানেও আপনাদের একটা ব্যাঙ্ক আছে। ওই দেখুন—

দেবাঞ্জনরা তাকাতেই পিংকির চোখে পড়ল একটা সুন্দর কাঠের বাড়ি। অনেক পুরোনো। কিন্তু এখনো কী সুন্দর। কাঠের লম্বা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে হয়। তবে

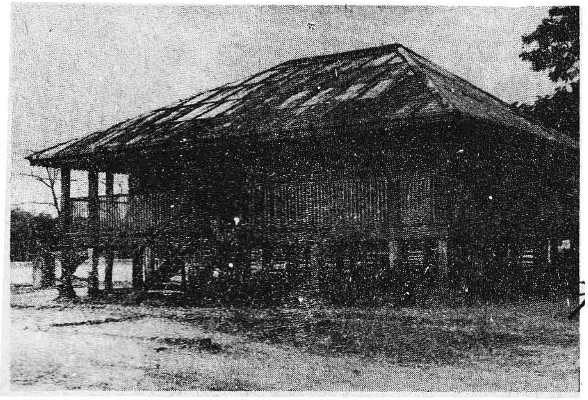

হ্যামিলটন সাহেবের ডাকবাংলো

বাড়িটায় বোধহয় কেউ থাকে না। দরজা-জানলা সব বন্ধ

পিংকি জিজ্ঞেস করল, ওটা কি? কার বাড়ি মামা!

—ওটাই তো এখানকার বিস্ময়! কুট্টিমামা জানাল, ওটা হ্যামিলটন সাহেবের ডাকবাংলো।

—হ্যামিলটন! সে কে?

—এক কল্পনা-বিলাসী ইংরেজ। অবশ্য শুধু কল্পনাই করতেন না। তাকে বাস্তব রূপ দিতেও জানতেন। আর তারই ফলস্বরূপ এই গোসাবা। তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছিলেন তিনি এই দ্বীপটি। দ্বীপটিকে ভালোবেসে এর নামকরণ করেছিলেন 'গোসাবা'। সম্ভবত গরু, সাপ আর বাঘের আদ্যক্ষর নিয়েই এই দ্বীপের নাম রেখেছিলেন তিনি গোসাবা। শুধু তাই নয়—

কুট্টিমামা বলতে লাগলেন, কোনোও কারণে ইংরেজ স্বজাতিদের সঙ্গে তার বিরোধ লেগেছিল। তিনি তাই এই দ্বীপকে একেবারে আলাদা একটা এস্টেট বানাবার জন্য একে সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে। এখানে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন। নিজস্ব কারেন্সীও চালু করেছিলেন। আর ঝাউয়ের পর ঝাউ গাছ লাগিয়ে এই দ্বীপকে করেছিলেন সুন্দর।

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিল পিংকি। এবার জিজ্ঞেস করল, শুনেছি এখানে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন।

—এসেছিলেন তো। ওই তো সেই ফলক।.... কিন্তু তুই কার কাছে শুনলি?

—বাবা বলছিল কালকে।

সেদিন আর কোথাও বেরোনো হলো না। চান করে

খেয়ে নিয়ে দুপুরের দিকে খানিকটা বিশ্রাম। কুট্টিমামা অবশ্য তারই মধ্যে সেই লোক দুটির সংগে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলো। পিংকিদের জানালো, আজ আর কোথাও বেরোবে না সে। কাল খুব ভোরে উঠে সজনেখালিতে যাবে। পিংকি যদি বিকেলের দিকটায় নদীর ধারে ঘুরতে চায় তো দেবাঞ্জনের সংগে যাক।

–সে তো যাবেই নন্দু। তুই না হয় অনেকবার এসেছিস। আমাদের তো এই প্রথম। একটু ঘুরে দেখবো না।

–হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই তো বলছি, যা তোরা ঘুরে আয়। তবে বেশি দূরে যাস না। রাস্তা হারিয়ে ফেললে বলবি কানাই সরকারের বাড়ি যাবো। এক কথায় দেখিয়ে দেবে।

কুট্টিমামার কথায়, সেই লোকটি লঞ্চ-ঘাটে যে আর একজনকে নিয়ে পিংকিদের জন্য অপেক্ষা করছিল, সে বলে উঠলো, হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই করবেন। রাস্তা গোলমাল করে ফেললে আমার নাম বলবেন–কানাই সরকারের বাড়ি যাবো।

বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে চলে এসেছিল, একজায়গায় এসে একটা জিনিস দেখে খুব অবাক হয়ে গেল পিংকি। নদীর পাড়ে–গাছগাছালির ফাঁকে একটা জায়গায় মস্ত বড় একটা নৌকা উল্টে রাখা। বড় কাঠের লগি দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখা হয়েছে। আর একটা লোক সেই নৌকাটা মেরামত করছে। কিন্তু লোকটাকে কোথায় দেখেছে পিংকি! ঠিক এই চোখ, এই মুখ। ভাবতে না ভাবতেই লোকটি মুখ তুলে তাকাল। সংগে সংগেই পিংকির সংগে চোখাচোখি হয়ে গেল তার।

–কি খোকাবাবু কোথায় উঠেছেন! কার বাড়ি?

পিংকি এগিয়ে গিয়ে নামটা বলতেই লোকটি মাথায় হাত ঠেকালো, খুব ভালো মানুষ গো; বড় মানুষ। আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে।

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল লোকটি, সেই সময়ে বাঁধের নিচ থেকে তড়িৎ চেঁচিয়ে ডাকল।

–এই দেবু দেখে যা–পিংকিকে নিয়ে আয়।

তড়িতের ডাকে পেছনে ফিরতেই পিংকির নজরে পড়ল অসংখ্য মাছ। ছোট বড় নানান সাইজ অনুযায়ী সেগুলো বেছে রাখছে কিছু লোক। চিংড়িই বেশি। বাগদা আর গলদাকে আলাদা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আলাদা রয়েছে বড় বড় ভেটকি আর পারশে। তোপসে মাছও চোখে পড়ল প্রচুর। ততক্ষণে দেবাঞ্জনমামা তৈরি হয়ে নিয়েছে। পিংকি দেখল, প্রায় কাউকে না জানিয়েই পরপর কয়েকটা ছবি তুলে নিলো সে। তারপর মাছের আড়তদারদের সংগে মাছ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো দেবাঞ্জনমামা।

ঘুরতে ঘুরতে বেলা পড়ে এসেছিল। ফেরার সময় নদীর ধারে প্রায় জলের কাছাকাছি বসে একটি মাঝবয়সী লোককে কী করতে দেখলো ওরা। প্রথমে তড়িৎ-ই লক্ষ্য করেছিল। সে ডেকে দেখাতেই পরপর ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে এতদূর থেকে কিছুই দেখা যায় না। দেবাঞ্জনের কথামতো পিংকিরা তখন আস্তে আস্তে বাঁধের গা বেয়ে নিচে নেমে গেলো। জলের কাছাকাছি আসতেই দেখলো, লোকটির হাতে একটা শক্ত লোহার তার। তারটাকে সে অনেকটা ইংরেজী 'এস' অক্ষরের মতো বাঁকিয়ে নিয়েছে। আর সেই বাঁকানো তারটা নিয়ে থেকে থেকে সে নদীর ধারের জলের পাশে বেছে বেছে কতগুলো গর্তে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এমনি দু'তিনটে গর্তে ঢোকাবার পর হঠাৎ একটা গর্ত থেকে মাঝারি সাইজের একটা কাঁকড়া উঠে এলো। এরপর পাশে রাখা একটা মাটির কলসীর ঢাকনা সরিয়ে কাঁকড়াটা সে ছেড়ে দিলো সেখানে।

দেবাঞ্জন মামা জিজ্ঞেস করলো, এভাবে কতক্ষণ কাঁকড়া ধরছেন আপনি?

লোকটি একবার মুখ তুলে তাকালো। মুখে সারা গালে শাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। খকখক করে খানিকটা কেশে নিয়ে বললো, দুপুর থেকে।

–কত কাঁকড়া পেয়েছেন!

লোকটি উত্তর দিলো। কিন্তু ঠিক কত বললো না। না বললেও পিংকি ততক্ষণে মুগ্ধ হয়ে গেছে লোকটির কাঁকড়া তোলার কায়দা দেখে। কিন্তু এত কাঁকড়া দিয়ে কী করবে ও!

তড়িৎমামাকে জিজ্ঞেস করতেই বললো, কী করবে আবার বাজারে নিয়ে বিক্রি করবে। না হয়–ওই যে শুনলে না আড়তদারদের কাছে জেলেরা কাঁকড়াও দিয়ে যায়, হয়তো সেখানেই বেচে দিয়ে আসবে। আড়তদারেরা ওগুলো পাঠিয়ে দেবে শহরের বাজারে।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। সেই সংগে ঠাণ্ডা। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, তাই ওরা তাড়াতাড়িই বাড়ির দিকে ফিরে চললো।

[চলবে]

ছবি: দেবাশিস রায়

সলিলকুমার গুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা।

পন্ডিত কাফি খাঁ

কালোবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পন্ডিত কাফি খাঁ-এর নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। মোঘল সম্রাট ঔরংগজেবের আমলে শ্রেষ্ঠ পন্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই কাফি খাঁ। তিনি ঔরংগজেবের ছেলে মোয়াজ্জেমকে পড়াতেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কাফি খাঁ মোয়াজ্জেমকে পড়াতে আসতেন। একদিন বিকালে বৃষ্টি হওয়ার দরুন কাফি খাঁ যখন পড়ার ঘরে ঢুকলেন তখন তাঁর পা ভর্তি কাদা। তিনি মোয়াজ্জেমকে ডেকে বললেন, 'বাবা, এক ঘটি জল নিয়ে এসো তো।' মোয়াজ্জেমের ব্যক্তিগত রক্ষীরা চমকে উঠলো, কী আস্পর্ধা এই কাফি খাঁর, সম্রাটের ছেলেকে পা ধোয়ার জল আনতে বলে!!

বেশ কিছু পুরস্কার লাভের আশায় রক্ষীরা সেই খবর পৌঁছে দিলো ভারতসম্রাট ঔরংগজেবের কানে। ভারতসম্রাটের আদেশে পরদিনই পন্ডিত কাফি খাঁকে উপস্থিত হতে হলো ঔরংগজেবের সভায়। অন্যদিনের তুলনায় সেদিন রাজ্যসভায় বেশি ভিড়। পন্ডিত কাফি খাঁ-এর বিচার হবে–এ কি সোজা কথা! সভার মধ্যে অনেকেই পন্ডিতের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁরা মুখ টিপে হাসলেও অন্যরা পন্ডিতের বিচারের জন্য উৎকণ্ঠা ভরে অস্বস্তিতে বসেছিলেন।

এমন সময় ভারতসম্রাটের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'পন্ডিত, আপনাকে কেন এখানে হাজির করা হয়েছে জানেন?' কাফি খাঁ জানেন না, কেন তাঁকে সভায় আনা হয়েছে। তিনি ধীর স্থিরভাবে বললেন, 'হুজুর, কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছে আমি ঠিক জানি না। তবে, জ্ঞানত আমি কোন অন্যায় করি নি।'

ঝলসে উঠলেন ঔরংগজেব, 'করেন নি? গতকাল মোয়াজ্জেমকে পড়াতে আসার সময় কোন অন্যায় করেন নি?'

'হুজুর, কেবলমাত্র মোয়াজ্জেমকে পড়াতে আসার সময় নয়, পড়াতে আসার আগে বা পরে আমি কোন অন্যায় করেছি বলে মনে পড়ছে না। আর, মহামান্য সম্রাট যদি আমার অন্যায় সম্পর্কে জানেন, তাহলে জানালে খুশি হবো এবং যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেবো।' পন্ডিতের এই কথা শুনে সভাসুদ্ধ সকলে পন্ডিতের মস্তকবিহীন দেহটার কথা চিন্তা করে শিহরিত হলেন।

সম্রাটতনয় মোয়াজ্জেম
পন্ডিত কাফি খাঁ-এর পা ধুয়ে দিচ্ছে।

'গতকাল আপনি আমার ছেলে মোয়াজ্জেমকে পা ধোয়ার জন্য জল আনতে বলেন নি? এটা কি অন্যায় নয়?' সম্রাট তাকালেন সভাসদ্‌দের দিকে এবং সভা থেকে তারস্বরে শব্দ এল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্যায়, ঘোর অন্যায়।'

ধীরে ধীরে নিচু মাথাটাকে সামনে তুলে পন্ডিত বললেন, 'মোয়াজ্জেম ভারতসম্রাটের ছেলে হলেও আমার ছাত্র এবং তার জন্যই আমি মোয়াজ্জেমকে জল আনতে বলেছি। এতে আমার অন্যায় হলে নিশ্চয়ই শাস্তি দিন।'

ঔরংগজেব মোয়াজ্জেমকে ডাকলেন এবং এক ঘটি জল আনালেন, 'শাস্তির জন্য প্রস্তুত হোন পন্ডিত।'

সকলে ভাবলেন, পন্ডিতের গর্দান না গেলেও লাঞ্ছিত হবেন তিনি। হয়ত-বা, নবাবের হুকুমে ঐ জল দিয়ে পন্ডিত কাফি খাঁ মোয়াজ্জেমের পা ধুয়ে দেবেন। চিন্তা বেশিদূর গড়াবার আগেই সম্রাটের হুকুম হলো, 'মোয়াজ্জেম, পন্ডিতজীর পা ধুয়ে দাও।' পন্ডিতের দিকে তাকিয়ে সম্রাট বললেন, 'পায়ে কাদা লাগলে কোনদিন মোয়াজ্জেমের কাছে জল চাইবেন না, পা ওকে দিয়ে ধুইয়ে নেবেন। এই আপনার যোগ্য শাস্তি।'

সভার লোক ভোজবাজীর মতো দেখল সভার মাঝে সম্রাটতনয় মোয়াজ্জেম পন্ডিত কাফি খাঁ-এর পা ধুয়ে দিচ্ছে। আর, পন্ডিতজীর আনন্দাশ্রু পুষ্পবৃষ্টির মতো টপ্ টপ্ করে মোয়াজ্জেমের মাথায় পড়ছে।

সলিলকুমার গুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা।

মহাপন্ডিত বিশ্বনাথ

নমিতা বসাক

এক ছিল রাজ্য। নাম মোহনাবতী।

সেই রাজ্যের রাজা খুব বেশি বিদ্বান না হলেও বিদ্যাচর্চা করতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর সভায় বহু বিদ্বান লোকের সমাবেশ ছিল। তাঁদের মধ্যে সেরা বিদ্বান ছিলেন বিশ্বনাথ পন্ডিত। সব শাস্ত্রে তাঁর দারুণ দক্ষতা। তাছাড়া তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও চর্চা করতেন।

—। রাজা ভীষণ রেগে গেলেন

একদিন সভায় বসে রাজামশাই বিশ্বনাথ পন্ডিতকে বললেন, "পন্ডিত, আপনি তো মহাবিদ্বান, আপনি গণনা করে বলুন তো আমার কোন রানী ভালো আর কোন রানী মন্দ।"

সভার সবাই রাজার প্রশ্নে সম্মতি জানাল।

রাজার তিন রানী। বড় রানী ভানুমতী, মেজ রানী কৌশল্যা আর ছোট রানী রমাবতী। রাজা তাঁর ছোট রানীকে সবচেয়ে পছন্দ করেন। বিশ্বনাথের ইতস্তত ভাব দেখে রাজামশাই বললেন, "কী হলো, পন্ডিত মশাই গণনায় বসুন।"

বিশ্বনাথ পন্ডিতকে বাধ্য হয়েই গণনায় বসতে হলো।

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বনাথ গণনা শেষ করে বললেন, "মহারাজ, আপনার বড় ও মেজ রানী খুব ভালো কিন্তু আপনার ছোট রানী আপনার রাজ্য ধ্বংসের কারণ হবে।"

রাজা ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি তাঁর ধৈর্যের রাশ ধরে রাখতে পারলেন না। এক প্রহরীকে ডেকে বললেন, "এই ভন্ড পন্ডিতকে এক্ষুণি কারাগারে নিয়ে যাও। কাল সকালে এঁকে জংগলে নিয়ে গিয়ে বধ করবে।"

বিশ্বনাথ রাজাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে দোষটা তাঁর নয়। কিন্তু রাজা তখন রাগে অন্ধ। কোন কথায় কান দিলেন না।

বিশ্বনাথ নিরুপায় হয়ে প্রহরীর সংগে চললেন।

পরদিন দুজন প্রহরী বিশ্বনাথ পন্ডিতকে জংগলের দিকে নিয়ে চললো। রাজ্যের সীমা পেরিয়ে জংগলে ঢোকার মুখে প্রহরী দুজন বললো, "পন্ডিত মশাই, আমাদের মাপ করুন, আপনার মতো মহাপন্ডিতকে

আমরা হত্যা করতে পারবো না, এই বন পেরিয়ে কংকাবতী রাজ্য দেখতে পাবেন, আপনি সেখানে চলে যান, সেই রাজ্যে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকুন।"

বিশ্বনাথকে রেখে প্রহরী দুজন ফিরে গেলো। বিশ্বনাথ বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। বন পেরিয়ে তিনি কংকাবতী রাজ্য দেখতে পেলেন। বহুকাল আগে তিনি এই রাজ্যে একবার এসেছিলেন।

এমন সময় এক চাষী তাঁর দিকে ছুটতে ছুটতে এলো। চাষীর ছোটার ভাব দেখে বিশ্বনাথ কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। চাষী কাছে এসে বললো, "আপনি মহাপণ্ডিত বিশ্বনাথ না?"

"হ্যাঁ।" বিশ্বনাথ মাথা নাড়লেন।

তখন চাষীর আর আনন্দ ধরে না। সে চেঁচিয়ে গ্রামবাসীদের ডাকতে লাগলো। সবাই ছুটে এসে বিশ্বনাথকে ঘিরে ধরলো।

একজন মোড়ল গোছের লোক বললো, "আপনি একজন মহাপণ্ডিত, আপনার কাব্য আমরা শুনেছি সুবল পণ্ডিতের মুখে, আমরা অভিভূত, মুগ্ধ, চলুন আমাদের রাজার কাছে।"

বিশ্বনাথ তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন।

লোকটা সব শুনে চিন্তিত মুখে বললো, "এখানে ঐ দেশের চররা আছে তাই আপনাকে ছদ্মবেশে থাকতে হবে কিছুদিন।"

বিশ্বনাথ বললেন, "আমাকে চাষীর বেশ পরিয়ে দাও, আমি কিছুদিন চাষ করি, তাতে আমার কাজ করাও হবে, ধরা পড়ারও ভয় থাকবে না।

প্রথমে কেউ রাজি হলো না। সবাই বললো, পণ্ডিত মশাই চাষ করবেন তাই হয় নাকি? কিন্তু বিশ্বনাথের জেদ সবাইকে রাজি করালো।

তারপর থেকে বিশ্বনাথ চাষবাস করতে লাগলেন। এইভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগলো।

ইতিমধ্যে মোহনাবতী রাজ্যে এক দারুণ কান্ড হয়ে গেছে। রমাবতী গোপনে পাশের রাজ্যে চম্পাবতীর রাজাকে চিঠি দিয়ে মোহনাবতী রাজ্য আক্রমণ করতে প্ররোচিত করছিল। শর্ত ছিল মোহনাবতীর শাসনক্ষমতা রমাবতীর হাতে দেওয়ার বিনিময়ে মোহনাবতীর একাংশ চম্পাবতীর রাজা পাবেন।

রমাবতীর প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে চম্পাবতীর রাজা মোহনাবতী আক্রমণ করতে প্রস্তুত হলেন।

এদিকে মোহনাবতীর সমস্ত সৈনিক সেনাপতি রাজাকে জানিয়ে দিলো বিশ্বনাথের মতো মহাপণ্ডিতকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ায় তাঁরা যুদ্ধ করতে নারাজ।

রাজা অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। এমন সময় প্রহরী দুজন রাজাকে সমস্ত কথা বললো। রাজা তক্ষুণি প্রহরী দুজনকে পাঠিয়ে দিলেন বিশ্বনাথকে খুঁজে আনতে।

প্রহরী দুজন অনেক কষ্টে বিশ্বনাথকে খুঁজে আনলো।

মোহনাবতীর সৈনিক সেনাপতিরা নতুন উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করে চম্পাবতীকে হারিয়ে দিলো।

রাজা রমাবতীকে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

পরদিন সভায় রাজা বিশ্বনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, "হে পণ্ডিত, বিশ্বব্যাপী আপনার পাণ্ডিত্য ছড়িয়ে পড়ুক। বুঝেছি কত আপনার জনপ্রিয়তা। সবাই আপনাকে কত ভালোবাসে।"

ছবিঃ দিলীপ দাস

মেদিনীপুর জেলার কন্টাই-এর অন্তর্গত চন্দ্রবাগান রোড থেকে প্রফুল্লচন্দ্র কুন্ডু মহাশয় তাঁর স্বর্গত মাতা ঈশ্বরমণি কুন্ডুর স্মৃতি রক্ষার্থে সাহিত্য প্রতিযোগিতার আহ্বান করছেন

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে

ঈশ্বরমণি কুন্ডু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাওয়া হচ্ছে।

বিষয়বস্তু :

গরমের ছুটিতে

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে শ্রাবণ ১৩৯২ প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার—১৫ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার—১০ টাকা

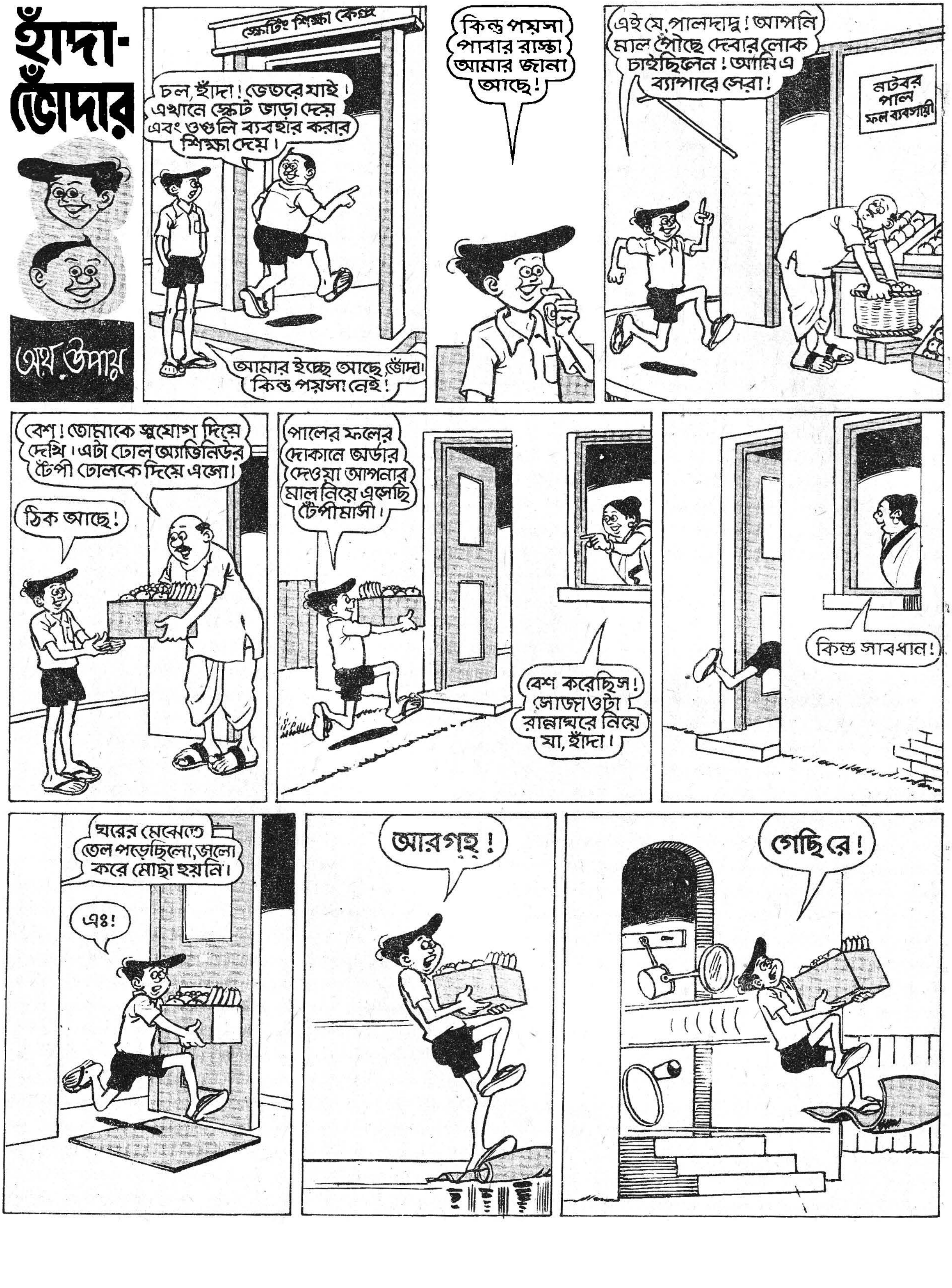

হাঁদা-ভোঁদার
অর্থ উপায়
স্কেটিং শিক্ষা কেন্দ্র
চল, হাঁদা! ভেতরে যাই। এখানে স্কেট ভাড়া দেয় এবং ওগুলি ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়।
আমার ইচ্ছে আছে, ভোঁদা। কিন্তু পয়সা নেই!
কিন্তু পয়সা পাবার রাস্তা আমার জানা আছে!
এই যে, পালদাদু! আপনি মাল পৌঁছে দেবার লোক চাইছিলেন! আমি এ ব্যাপারে সেরা!
নটবর পাল ফল ব্যবসায়ী
বেশ! তোমাকে সুযোগ দিয়ে দেখি। এটা ঢোল অ্যাভিনিউর টেঁপী ঢোলকে দিয়ে এসো।
ঠিক আছে!
পালের ফলের দোকানে অর্ডার দেওয়া আপনার মাল নিয়ে এসেছি টেঁপীমাসী।
বেশ করেছিস! সোজা ওটা রান্নাঘরে নিয়ে যা, হাঁদা।
কিন্তু সাবধান!
ঘরের মেঝেতে তেল পড়েছিলো, ভালো করে মোছা হয়নি।
এঃ!
আরগহ্!
গেছি রে!

ওফ্!
পরে
এবারের এই মাল নিয়ে আমি ঐ বেড়া ডিঙিয়ে সর্ট-কাট করবো।
এই ফুটিটা প্রদর্শনীতে নির্ঘাত কিছু পুরস্কার পেতে পারে।
ওপ্‌স্!
বাঁচাও! আমি পিছলে যাচ্ছি!
গেছি রে!
এই, হাঁদা! ঐ স্কেটিং শিক্ষা কেন্দ্রে আমার খুব দুর্ভোগ গেছে মাইরি! সমস্ত জায়গাটাতে আমি পিছলে আছাড় খেয়েছি!
আমার অনেক জায়গায় কেটে আর থেঁতলে গেছে। তোর বরাত ভালো পয়সা ছিলো না বলে ঢুকতে পারিসনি।
রসিকতা করছিস নাকি?
ওঃ! গেলুম রে!

নতুন ধাঁধা

শিবভক্ত আগাগোড়া
মৃতদেহ মুন্ডহারা ।
পেয়েছিলাম শিশুকালে
আর পাবো না কোনো কালে ।।
–অলোককুমার চট্টরাজ/রক্ষিতপুর
দুর্গাপুর-১২

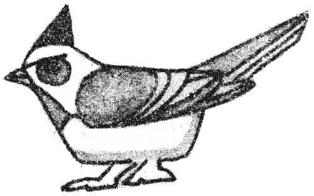

অতি ভোরে থাকে সে-ই
সন্ধ্যাতেও রয়,
সেটি হাতে পেলে হও
খুশি অতিশয় ।
–হরেন ঘটক/কলকাতা

বৈশাখ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর–
১। দরবেশ ২। ময়রা ৩। কালিদাস ৪। চপ্পল

মাথা কেটে ফুল হয়,
লেজ কেটে বিয়ে হয়
তিনে মিলে শেষ হয় ।
–অনুরাধা পাল/রেলওয়ে কলোনী, খড়গপুর ।

মাথা কেটে নিয়ে যাও
পেট কেটে বলে যাও
লেজ কেটে যন্ত্র রয়
বিবাদে তা পূর্ণ হয় ।
শংকর ভট্টাচার্য/জিয়াগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

।। কলকাতা ।।

গৌতম, প্রসূন, অনু, রবিন, খুকু, ময়না, মামীমা, ছোট দিদিমা, নীলু, মুকুল ও চন্দন/ বৈকুণ্ঠ ঘোষ রোড, কসবা, কলকাতা-৪২; অনির্বাণ বসাক, ছোট মামা, বড় মামা ও অন্যান্যরা/ জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলকাতা–৯; স্বপ্না, টুকু, রাণা, বুবাই ও বাবাই/ বেলেঘাটা, কলকাতা–১০; কমল, মীরা, মিম্মি ও মিতিল/ নিমতলা লেন, কলকাতা–৬; ইলোরা, ইন্দিরা ও মা-বাবা/ গাঙ্গুলি বাগান, কলকাতা–৪৭; পারমিতা ও গৌতম ঘোষ/ বেহালা, কলকাতা–৩৪; সেঁজুতি ভাদুড়ী/ বেলেঘাটা মেন রোড, কলকাতা–১০; অপর্ণা রায়/রায়পাড়া হাউজিং এস্টেট, কলকাতা-৫০; তমাল দাশগুপ্ত/ ইব্রাহিমপুর, কলকাতা–৩২; তুহিনা মিত্র/ সল্ট লেক, কলকাতা–৬৪; স্বপ্না, শিখা, সৌমিত্র ও দেবশ্রী/ বডি গার্ড লাইনস, কলকাতা–২৭; কণি, যূথি ও বাচ্চু/ সেন্টার সিঁথি রোড, কলকাতা–৫০; দীপু, চন্দন, পিন্টু এবং চঞ্চল বন্দোপাধ্যায়/ টালিগঞ্জ, কলকাতা–৪০; বিদ্যুত, মিনু, সুব্রত কৃষ্ণা, খুকু, বেবী, পাপুন ও মিঠুন/ বেহালা,কলকাতা–৩৪;

।। হাওড়া ।।

অমিতাভ, অরুণাভ, অনামিকা, অনন্যা, ডায়না ও রাজা/ সদর বক্সী লেন, হাওড়া–১; সাধনা, খোকন ও বাপ্পা চ্যাটার্জী/বি. গার্ডেন, হাওড়া; রাণা, রাজা, মৌ, বাপী ও মা-মণি/ আনন্দকুমার রায়চৌধুরী লেন, শিবপুর হাওড়া–২; তারক, মলয় ও কাজল ঘোষ/ বাগবেড়, হাওড়া; নির্মলেন্দু ঘোষ ও রমেশচন্দ্র দত্ত/ ডোমজুড়, হাওড়া; অচিন, সুনীতা, অরিন্দম ও অনির্বাণ মুখার্জী/ কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া;

।। হুগলী ।।

সীমা বসু, দীপা বসু/ বৈদ্যবাটি, হুগলী; সোনাই ও টিনা দত্ত/ আরামবাগ, হুগলী; প্রবীর খাঁ/ আরামবাগ, হুগলী; মা-বাবা, বৌদি, রমা, অচিন্ত্য,প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ/ আরামবাগ, হুগলী; বুই, টুকাই, বাবুয়া, মা ও অন্যান্যরা/ ব্যান্ডেল;

।। ২৪ পরগনা ।।

পিনাকী দে/ নবজীবন কলোনী, বিরাটি; শ্যামলী, বিজলী, কৃষ্ণেন্দু ও সোনালী/ হায়দাদপুর, খাঁটুরা; সুস্তা ঘোষাল, প্রসাদ বাচস্পতি ও কাকলি চক্রবর্তী/নৈহাটি; আলভা, অরিন্দম ও দীপংকর মিত্র/ নহাটা; তরুণ, তড়িৎ, তুষার, মা-বাবা, বৌদি ও সৈকত/ ইছাপুর, ষষ্ঠীতলা; সোনা, বারি, ঝিলম, বাবাই, তিতির ও তপু সেনগুপ্ত/ বাঁশদ্রোণী প্লেস; পিনাকী, চন্দ্রানী দত্ত ও ছোটকাকু/বড়জোড়পুর, কাঁচরাপাড়া; শুভজিৎ, রামকৃষ্ণ, চিন্ময়, ঋত্বিক ও চন্দন গুপ্ত/ নরেন্দ্রপুর;

।। বর্ধমান ।।

অলোককুমার চট্টরাজ/ বিধাননগর, দুর্গাপুর; প্রদীপ, দীপক, অশোক, অলোক ও দেবকুমার চট্টরাজ/রক্ষিতপুর; বাবা-মা, মণি ও ছোটন/ ওয়েস্ট আপকার গার্ডেন, আসানসোল; অশোক, গীতা, অভীক ও বনানী ঘাঁটী/ নিউ ঘুষিক কলিয়ারী, কালিপাহাড়ী, সৌম্যশান্ত, শুদ্ধসত্ত্ব, সিদ্ধার্থ ও কাঞ্চন ঘাঁটী/ মহিশীলা; গৌরীশংকর, জয়শংকর, নিয়তি, কৃষ্ণা রায় ও কল্লোল বসাক/ পাওয়ার হাউস পাড়া; সলিল, গোবিন্দ, মুকুন্দ ও অন্যান্যরা/বেড়ুগ্রাম; মিতা, মিঠু, রীতা শিম্পু, বাপ্টু ও বিমল/ খালুইবিল মাঠ;

।। মেদিনীপুর ।।

টুলু ও বুবু দাস/ তালবাগিচা, খড়গপুর; শিবানী ও বিশু জানা/বামুনডিহা; মা-বাবা, রীতা, নন্দিতা ও শুভ্রা বসু/ নিউ ডেভেলপমেন্ট রেলওয়ে কলোনী/ খড়গপুর;

।। বীরভূম ।।

দেবীপদ, মীনাক্ষী,চন্দনা/ বোলপুর; রূপোলী, মিহির, তপু ও গুবাই/ সাঁইথিয়া; শ্যামল, গীতালি, অশোক ও বিষেণ রায়/ সিউড়ি;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

রবি, রেখা, সীমা, তুষার ও জয়ন্তকুমার বৈদ্য /ডোমকল; দেবাশিস বৈদ্য/ নেতাজী সুভাষ রোড, খাগড়া;

।।বাঁকুড়া।।
শ্যামল বিশ্বাস/সোনামুখী; অরূপ, সজল, বিশু, সুশীলকাকু ও রাজা/ গঙ্গাজলঘাটী; নিবেদিতা ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও গৌর সরকার/ নতুন চটী, যোগেশপল্লী;

।। পুরুলিয়া ।।
অনিন্দ্যসুন্দর ও সুলক্ষ্মা মুখার্জী/ আদ্রা; দিলীপকুমার চৌধুরী/ মধুপুর, মানবাজার;

।। মালদহ ।।
গৌতম গুহ, কৌশিক দাস, ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী ও জহর গাঙ্গুলী/ ঝলঝলিয়া, দেশবন্ধুপাড়া; বাসব, সৌরভ, কল্পনা, শম্পা ও টুকটুকি/ বাঁশুলীতলা রোড;

।। জলপাইগুড়ি ।।
ছোটমা, বড়মা, দিদি ও অচিন্ত্যদা/ নয়াবস্তী; পুচু, বাবু, ইতু, মলি, থিপু ও রাণা/ আশ্রমপাড়া;

।। বিহার ।।
দীপ্তিমান ও দীপঙ্কর বিশ্বাস/গোমো, ধানবাদ; পুতুল, সুদাম ও টুকু, স্বপন, মানা, রীণা, টিটো ও মা-বাবা/ জামশেদপুর; মা-বাবা, পিন্টু, ময়না, লুনা, টুম্পা, রিন্টু, দাদা ও সৌমেন/ সাউথ টিসরা কোলিয়ারী, ধানবাদ; তুলতুলি ও বিশ্ব/ খঞ্জরপুর, ভাগলপুর; প্রতিমা, মাধবী ও পঙ্কজ/গোমো, বিহার।

মাঘ সংখ্যার ধাঁধার বাকি উত্তরদাতাদের নাম:

।।হাওড়া।।
সাধনা, বিশ্বজিৎ ও দেবজিৎ চ্যাটার্জী/ বি, গার্ডেন; ঝুমা, বুড়ি, ডলি, বুলবুলি, মণি ও স্বাতী/ ডোমরজলা, ইছাপুর; চন্দ্রনাথ, চিত্রা অমিত, ইন্দ্রনাথ ও মিত্রা পাল/ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেন, শিবপুর; বরুণ, অরুণ ও রীতা চ্যাটার্জী/ আন্দুল মৌড়ি, শীতলাতলা; নির্মলেন্দু ঘোষ ও রমেশচন্দ্র দত্ত/ বারুইপাড়া, ডোমজুড়; শ্রাবণী, মৌসুমী, চৈতালী ও অভিজিৎ সরকার/ হাওড়া ভারতমাতা গলি; মীনা, চন্দ্রা তন্দ্রা, কণিকা/ পাতিহাল;

।।মেদিনীপুর।।
ঋতা, নন্দিতা ও শুভ্রা বসু/ রেল কলোনী, খড়গপুর; বিপুল ও বিটু/ ঝাড়গ্রাম; দেবাশিস চৌধুরী/ বার্জটাউন; শ্রীলেখা, মণিকা, স্বর্ণেন্দু ও সৃপ্তি/ গড়বেতা; স্বপনকুমার মন্ডল/ খড়গপুর; বিপুল হাজারী/ বাঁশদা, রাধামোহনপুর;

।।বীরভূম।।
রাইনা, দোলন, পাঁপড়ি, অনন্ত, সুব্রত ও মা/ শিহুলিয়া; কণক, অবন, সুমি, বাপ্পা ও হরফ/ সাঁইথিয়া;

।।নদীয়া।।
দেবযানী, চন্দ্রাণী, লোপাবুনু, মাম্মা ও সজল বসু/ পায়রাডাঙ্গা; রাখী, সাথী, বাবলি, বিলু, চনি/ কৃষ্ণনগর বাস স্ট্যান্ড; নিশীথ, শিপ্রা ও শিল্পী দে/ ষষ্ঠীতলা, নবদ্বীপ; দিবানন্দ প্রামাণিক/ ডাবরে পাড়া লেন, শান্তিপুর;

।।বাঁকুড়া।।
চঞ্চল মন্ডল, নির্মলেন্দু মাজী, বিদ্যুৎ মুখার্জী ও হীরেন মাহাতো/ গঙ্গাজলঘাটী; মাঃ বিশু, উজ্জ্বল, বীণা ও শিখা মাজী/ গঙ্গাজলঘাটী; অরূপ, সজল, কোচিন, ঝন্টু ও অজয় মিত্র/ গঙ্গাজলঘাটী; অনন্ত, শুভ্রা, রাজশ্রী, টুকটুকি, রাজা ও রাণা/ গঙ্গাজলঘাটী; দিবেন্দু, কচি, বাবলু ও অশোক/ দোলতলা; বুলু ও লাবু/ নাজিরবান লেন, তরুণ সিং ও রবি সিং/ ওন্দা;

।।হুগলী।।
মেনু, বাবু, বাবা ও মা/ নিত্যানন্দপুর; মমবাড়ি প্রাঃ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ; ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়/ চন্দননগর; বাবা-মা, রিঙ্কু, টিঙ্কু ও অনল মুখার্জী/ চুঁচুড়ো স্টেশন রোড;

।।বর্ধমান।।
মিঠুন গোস্বামী ও অনিরুদ্ধ গোস্বামী/ শিবাজী রোড, দুর্গাপুর; সুতপা, সুবিমল, সুপ্রিয়, সুধা, তপনকাকা, নন্দ ও বন্দনা/ বিধাননগর হাউজিং কলোনী, দুর্গাপুর; পাপাই কাঞ্জিলাল/ দুর্গাপুর-৪; বিকাশ, কল্পনা, কাবেরী, দেবাশিস ও পলাশ নন্দী/ লোক কলোনী, আসানসোল; পাপু, শম্পা, আলো, সন্তু, টিংকু ও ছোটকাকু/ কাঁকসা; শাশ্বতী, সোমা ও রত্না গোস্বামী/ এ.বি.এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর; মুনমুন, রীণা ও ঝুমা ব্যানার্জী/ মাইন্স রেস্কু স্টেশন, সীতারামপুর; রীণা মাথুর/ বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩; সবিতা, শিঞ্জিতা, মিতা, মা ও বাবা/ বার্নপুর;

।।পুরুলিয়া।।
পলাশ, মুনমুন, কাকা, মা ও বাবা/ মুনসেফডাঙ্গা, বরাকর রোড, রঘুনাথপুর; অনুপম, রাজকুমার, অঞ্জনা, সুবল ও অন্যান্যরা/ মধুপুর, মানবাজার;

।।উত্তরবঙ্গ।।
পুলক, অলোক ও গৌতম কয়াল/ শিলিগুড়ি, দার্জিলিং; দীপায়ন, শুভায়ন, মা ও বাবা/ অরবিন্দনগর, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, জলপাইগুড়ি; রাখী ও টিংকু গুপ্তা/ ঝলঝলিয়া, দেশবন্ধুপাড়া, মালদহ;

।।বিহার।।
পূর্ণিমা, প্রীতি, মুকুল, রুণু ও বাবা-মা/ টাটা কলোনী, ধানবাদ; তাপস ও লুনা হাজরা/ তেঁতুলতলা, ধানবাদ; তপতী, জ্যোতী, সোনালী/ টাটানগর রেলওয়ে কলোনী, জামশেদপুর; টুকুন, বুবুন, ঝুলন ও বাবা-মা/ টেলকো, জামশেদপুর;

পরপর পাঁচটি কুকুর আছে। বলতে পারো এদের মধ্যে কোন দুটিকে দেখতে একরকম?

ক খ গ ঘ ঙ

–উত্তর আগামী সংখ্যায়

বৈশাখ সংখ্যার ছবিতে শব্দমালার উত্তর :-

চ	শ	মা		সে	তু		ব		বা	গা	ন
র			দ্বা	তা		সি	ন্দু	ক		ম	
খা	তা			র	থ		ক		বি	দ্বা	না
	লা	ট্টু			নি	চু			দ্যা		ক
পা			মচ	লা		ড়ি		ক	ল	ম	
ল	ষ্ঠ	ন		উ			প্র		য়		শ্রা
ক			জা		বা	ন	তি			ফু	ল
	স		মা	খ	ন		মা		গ		মা
ব	জ	রা			র	বি		ত	র	বা	রি

ছবির মজা

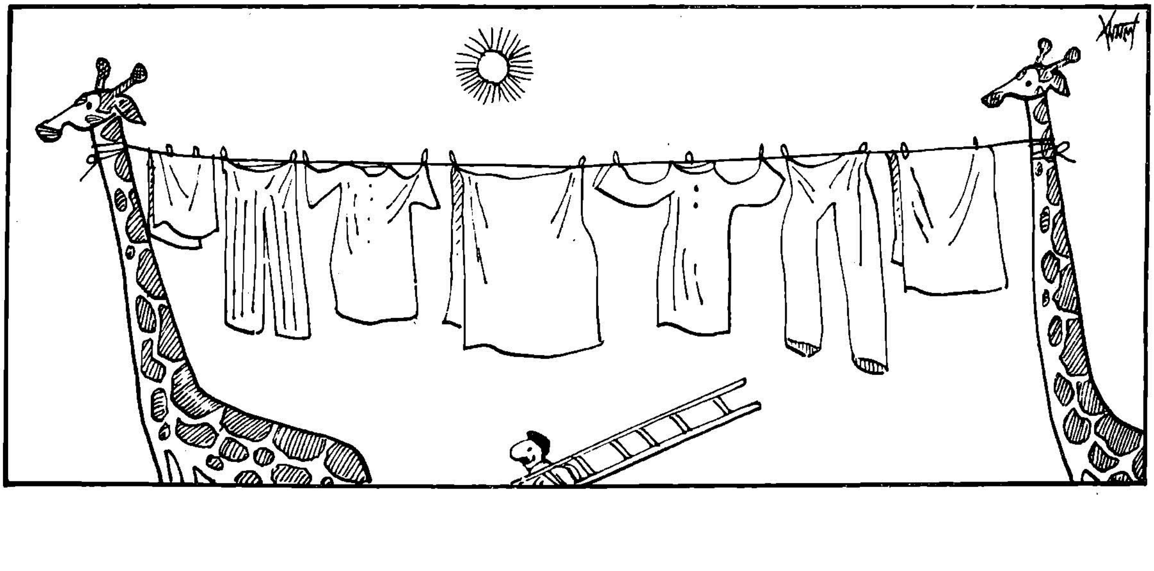

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

কী গরম! প্রাণ আইঢাই করে। তার ওপর আবার যদি লোডশেডিং হয় তাহলে তো কথাই নেই। খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়ে এই মাসটা কিন্তু দারুণ। আম, কাঁঠাল, জামরুল, লিচুর ছড়াছড়ি। জ্যৈষ্ঠমাসে অত গরম পড়ে বলেই তো ফলগুলো সব পাকে। সব কিছুরই একটা ভালো আর একটা মন্দ দিক আছে, তাই না?

তোমরা কি কখনো লক্ষ্য করেছো এখন দিনটা কতো বড়! সূর্যদেব উঠে পড়েন ভোর চারটে উনষাট মিনিট দশ সেকেন্ডে। আর অস্তে যান ছটা ছ মিনিট ছ সেকেন্ডে। দিনটা কতো বড় বলো! আর রোদের কি তেজ! দুপুর বেলায় তো বাড়ি থেকে বেরুনোই যায় না! কোনো কোনো দিন আকাশের কোণে এক চিলতে কালো মেঘ দেখা যায়। বড় হতে হতে সেই মেঘ এক সময় দামাল হাওয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোঁ শোঁ আওয়াজ, বিদ্যুতের ঝিলিক, বাজের শব্দ। সব মিলিয়ে একটা ভয়ংকর ব্যাপার। কিন্তু তারপর—ঝড় বৃষ্টি যখন থেমে যায় তখন শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। কী ভালোই যে লাগে।

যারা গ্রামে থাকে তারা তখন আম কুড়োতে ছুটেছে। তার যে কি মজা তোমরা যারা কলকাতায় থাকো তা কল্পনাও করতে পারবে না।

ঝড়-বৃষ্টির পর আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে নির্মল আকাশে হাজার তারার ঝিকিমিকি। কোন্‌টা কোন্ তারা, কোন্ গ্রহ সে কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি। একটা কথা আবার বলছি, বৃশ্চিক রাশি এ মাসের নতুন নক্ষত্রমণ্ডলী। তারই মাঝখানে জ্বলজ্বলে তারাটা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রের নাম থেকেই এ মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ।

এই মাসে বাতাসে ভাসে চাঁপাফুলের গন্ধ। কতো রকম চাঁপাই না ফোটে! কাঠচাঁপা, কনকচাঁপা, কাঁঠালি চাঁপা, জুঁইচাপা। গন্ধও আলাদা আলাদা। এখনো কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, গুলমোহর আর বাঁদরলাঠি গাছ ফুলে ফুলে ভরা। আর অবশ্য বেশিদিন থাকবে না। গরমের সংগে আর কতোদিনই বা ওরা পাল্লা দিতে পারবে। তবে আসছে তো বর্ষাকাল! তারই প্রস্তুতি প্রকৃতির আনাচে-কানাচে।

শুকতারা তোমাদের কেমন লাগছে জানাচ্ছো না যে! কোন্ কোন্ লেখা ভালো লাগছে, কোন্‌টা লাগছে না, কিংবা কি ধরনের লেখা চাই—সব জানাও কেমন! শুকতারা তোমাদেরই পত্রিকা। তোমরা যেমন চাইবে—সেইরকমই তো হবে। ওদিকে আবার মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। আসলে ছাপার ভুল। কিন্তু ভুল তো ভুলই। মাঘ মাসের চেনা অচেনায় সিংহর বিষয়ে লেখা হয়েছিল। পড়েছিলে তো? তার এক জায়গায় আছে—'ভারতেও প্রচুর সিংহ আছে। তারা থাকে উত্তর-পূর্ব ভারতে।...' উত্তর-পূর্ব নয়। হবে—তারা থাকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

ভারতে সিংহরা কোথায় থাকে? কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন দেখো তাহলে যেন আবার উত্তর-পূর্ব বলে বোস না। বলবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

একদিনের ক্রিকেট খেলায় ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রবি শাস্ত্রী হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস! আর গাভাসকার ছেড়ে দিয়েছেন নেতৃত্বপদ। কপিলদেব আবার অধিনায়ক হয়েছেন। কতো সব ব্যাপার-ঘটে যাচ্ছে তাই না? দেখছো তো তরুণ খেলোয়াড়রা কেমন নাম করে ফেলছেন। শিবরামকৃষ্ণণের বয়স মাত্র আঠারো বছর। সদানন্দ বিশ্বনাথের একুশ। রবি শাস্ত্রী আর আজহারউদ্দিনের বাইশ। চেতন শর্মাও ওঁদের কাছাকাছি। আর দু এক বছরের মধ্যে দুএকজন ছাড়া পুরো দলটাই বোধহয় তরুণ খেলোয়াড়ে ভরে যাবে। বেশ হবে তাহলে!

ভাবছো তো—দাদুমণি আবার খেলার খবরও রাখে। আরে তোমাদের দাদুমণি যে! তোমরা যা ভালোবাসো, যা চাও দাদুমণিকেও যে তাই ভালোবাসতে হবে, তাই চাইতে হবে। এখন তো গরমের ছুটি। খুব মজা করছো তো? যতো পারো গল্পের বই পড়ে নাও এই ফাঁকে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সব।

—দাদুমণি

তোমাদের পাতা

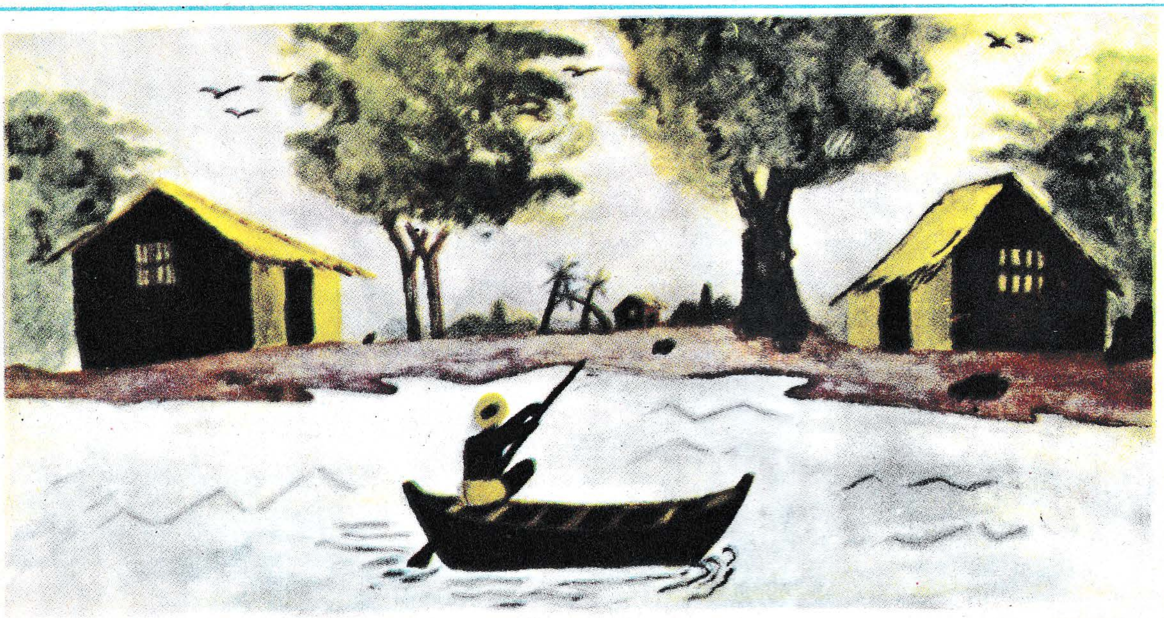

অমিতকুমার দে
বয়স পনেরো, একাদশ শ্রেণী প্রমথনগর, জামশেদপুর।

দান

মোহন আজকে হোস্টেলে ফিরে যাবে। সে গরমের ছুটিতে তাদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিল। তার বাবা মা বাড়িতে থাকেন। মোহন যা যা খেতে ভালবাসে মোহনের মা তাই রান্না করে দিচ্ছেন। মোহন আজকে খুব খুশি। কারণ তার বাবা তাকে দশটা টাকা দিয়েছেন হাত খরচের জন্য। এর আগে কোনোদিন বাবা তাকে হাত খরচের জন্য এত টাকা দেননি। মোহন ভাবল আজ সে একটা লটারির টিকিট কিনবে।

রাত্রের ট্রেনে সে চলে যাবে। তাই সে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বের হলো। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে দেখল একটি কুঁজো লোক নর্দমায় পড়ে গেছে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কেউ তাকে তুলছে না। লোকটা খুব কষ্ট পাচ্ছে। মোহন তখন লোকটিকে নর্দমা থেকে তুলে তার সেই দশটা টাকা তাকে দিয়ে দিল।

মানসী দত্ত অষ্টম শ্রেণী
বার্লো গার্লস স্কুল মালদা
বয়স ১২ বছর

লিমেরিক

বড়িশার হরিশা'র সরিষার কারবার
বড়িশার থেকে সোজা ডায়মন্ডহারবার।
সর্ষেতে ভূত ঢোকে,
তাই দেখে হরি শোকে,
সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে গেল মাড়বার !!

একদল বাঘ নাকি যেতে চায় কঙ্গে
তাই শুনে হৈচৈ পড়ে গেছে বঙ্গে !
কেউ বলে, বেঁধে রাখ
কেউ বলে, চলে যাক
তবে ল্যাজগুলো নিতে তারা পারবে না সঙ্গে !!

রণদেব গোস্বামী
বয়স—১৪/নবম শ্রেণী
বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়
১০৯/৩২, হাজরা রোড
কলিকাতা—২৬

দোলন রায়
বয়স পাঁচ
হাওড়া

শীত

সেদিন বিকাল বেলায় দেখলাম আমাদের বাড়ির সামনে চারটে বাচ্চা কুকুর শীতে কুঁই কুঁই করছে।

আমি তাদের বাড়ির উঠোনে এনে অল্প করে দুধ খাইয়ে চট পেতে শুইয়ে গায়ে চাপা দিলাম। সকালে উঠে দেখলাম তাদের মা তাদের পাশে শুয়ে আছে আর আমার দিকে এক ভাবে চেয়ে আছে। কী বলতে চাইছে কে জানে?

সোমালী ভট্টাচার্য বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী
উত্তরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় উত্তরপাড়া

হাতি

একযে আছে মস্ত হাতি
বিরাট দুটি কান।
চোখ দুটি তার ছোট্ট কেবল
শুঁড় দুলিয়ে যান।

রঙ খানি তার ভূষো কালো
লম্বা দুটি দাঁত।
চার খানি তার পা যে আছে
নেইকো কোন-হাত।

কচি কচি ফল মূল খায়
খায় সে কচি পাতা।
দেহখানি তার বিশাল কেবল
ছোট্ট হাতির মাথা।

রণজিৎ রায়
বয়স–তেরো
কোন্নগর
রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়

হেনরী সোনা

আদরের মোর কুকুর ছানা
নামটি তাহার হেনরী সোনা,
হয় না কোনো তার তুলনা
আমার বন্ধু হেনরী সোনা।
লোমে ভরা শরীরে তার,
সাদা কালো রঙের বাহার।
স্কুল থেকে বাড়ি যেই ফিরি,
ঝাঁপিয়ে পড়ে লেজটি নাড়ি।
মমতার করে কোলে তুলি,
… পেয়ে সকল ভুলি।
আদরের ছোট্ট হেনরী সোনা,
এর … কোনো তার তুলনা।

…াণী সাহা
…পুর পার্ক
কলকাতা–৬৮
বয়স–১৪

মোহনচন্দ্র মন্ডল
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
বেগাই হাই স্কুল

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

সাহেব বাংলোর ভূত

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরিক গ্যাঞ্জালেস

বাংলোর কাছাকাছি এসেই চোখ পড়লো বাংলোর বারান্দায় বসে কে একজন প্রসেনজিৎবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

আগন্তুকের চেহারায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার সাধারণ মানুষদের একজন মনে হয় না। রং খুব কালো নয়, চেহারাটা রুক্ষ, গালের হনু দুটো উঁচু, মাথার চুল কটা। আরও কিছুটা কাছাকাছি এসে দেখলাম ওর চোখের তারাদুটোও কালো নয়, কেমন বাদামী ছোপ ধরা। পরন হ্যাফসার্ট, প্যান্ট। হাতের সামনে রয়েছে ঠ্যাং বাঁধা একটা বড় সাইজের মুর্গী।

প্রসেনজিৎ আমাদের দেখতে পেয়ে উদাত্তকণ্ঠে বললেন—যাক্‌, মরনিং ওয়াক এতক্ষণে মিটলো। তোদের দেরি দেখে আমি তো ভাবছিলাম একেবারে ইভনিং ওয়াকটা সেরেই বুঝি ফিরবি।

আমরা ততক্ষণে বাংলোর গেটপেরিয়ে ঢুকে পড়েছি।

প্রসেনজিৎবাবু আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ আমার বন্ধু মেঘনাদ ভরদ্বাজ আর উনি অর্ণব সেন।

আগন্তুক ডান হাতটা আমাদের দিকে করমর্দনের ভঙ্গিতে এগিয়ে দিলেন।

করমর্দন করতে করতেই প্রসেনজিৎবাবুর মুখে আগন্তুকের পরিচয় শুনলাম—এরিক গ্যাঞ্জালেস। কোনো এককালে ওর পূর্বপুরুষ ছিল পর্তুগীজ। কিন্ত এখন ওকে খাঁটি বাঙালীই বলা চলে।

এরিক গ্যাঞ্জালেস পরিষ্কার বাংলাতেই বললো, আমি স্যার নিজেকে বাঙালী ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না। ছে[illegible] নাম দিয়েছি পবন। এই মাটির মানুষ হয়ে পূর্বপুরু[illegible] ওই সব খটমটে বিদেশী নাম বয়ে বেড়ানোর য[illegible] ছেলেকে আর ভোগ করতে দেব না—বলেই হেসে উ[illegible] গ্যাঞ্জালেস।

প্রসেনজিৎবাবু গ[illegible]ঞ্জালেসের আরও পরিচয় [illegible] বললেন, এ আমায় [illegible]ই ভালবাসে। মৌ[illegible]নিতে [illegible] পোলট্রি ফার্ম। [illegible] মাঝে মধ্যেই তাজা মুর্গী [illegible] খাওয়ায়।

গ্যাঞ্জালেস [illegible]লো, শুনলাম মজুমদার সা[illegible] গেস্ট এসেছেন [illegible] গেস্ট মানে তো আমাদের

মৌ রও গেস্ট, তাই.....

রও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর এরিক গ্যাঞ্জালেস বিদায় নিল।

ঘনাদ বললো, এত বেলায় এখানে মুর্গী রাঁধবার লোক পাওয়া যাবে তো?

সেনজিৎবাবু বললেন; সে ভাবনা আমার দোস্ত। বই একটা হাঁক ছাড়লেন, পশুপতিবাবু।

পশুপতি ভট্টাচার্য অফিস ঘরের মধ্যেই ছিলেন, হাঁক শুনে বেরিয়ে এলেন।

দিবাকরকে বলুন এই রামপাখিটা যেন ও ওর বউকে দিয়ে আজকে আমাদের রান্নার মেনুর সংগে যোগ করে দেয়।

আচ্ছা স্যার। আর কিছু না বলে পশুপতিবাবু মুর্গীটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

পশুপতিবাবু চলে যাওয়ার পর প্রসেনজিৎবাবুকে বললাম, পরম সাত্বিক ওই ব্রাহ্মণটিকে শেষ পর্যন্ত মুর্গী দিতে হলো প্রসেনজিৎবাবু?

মেঘনাদের হেঁয়ালি

দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা সত্যিই বড় জমজমাট হলো। ওয়াচ-ম্যান দিবাকর মাহাতোর বউ সকাল বিকেল প্রসেনজিৎবাবুর জন্যে রান্না করে আনে। সেদিনের রান্না ছিল ওর স্পেশাল। বউটির রান্নার হাত সত্যিই ভাল। আমরা অন্যদিনের চেয়ে বেশিই খেয়ে ফেললাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় আড় হয়ে আমরা গল্প জুড়লাম।

গল্প মানে সেদিন সকালে মৌবনির জংগলে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত সব ঘটনাগুলো। সব শুনে প্রসেনজিৎবাবু বললেন, কী সাংঘাতিক! আমি তো এসবের মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না মেঘনাদ।

মেঘনাদ বললো, মাথা এবং মুন্ডু যে সুতোয় বাঁধা মনে হয় খুব শীগগির তাতে টান পড়বে। সেটুকু সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

এর অর্থ? কথাটা প্রসেনজিৎবাবু জিজ্ঞেস করলেও মেঘনাদের এ হেঁয়ালির অর্থ আমিও বুঝলাম না।

অর্থ ব্যাপারটাই অনর্থ।

বলতে বলতে হেঁয়ালিকে আরও জট পাকিয়ে হাই তুললো মেঘনাদ। বললো, আপাতত আর পারছি না বন্ধু, আজ যে পরিমাণ মুর্গী পেটস্থ করেছি তারা আমায় বিছানায় চিৎ না করে ছাড়বে না মনে হচ্ছে।

ঘুম আমারও পাচ্ছে। আর একেই বলে বোধহয় ভাত-ঘুম। কলকাতায় নানা কাজকর্মের মধ্যে দুপুরে ঘুমের কথা ভাবতে পারি না। কিন্তু এখানকার এই মুক্ত প্রকৃতির অবকাশে শরীরটা আলসে হয়ে উঠেছে।

কখন যে বিছানায় লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঘুম ভেঙেছে মেঘনাদের হাতের ঠ্যালা খেয়ে।

তাকিয়ে দেখি তখনও সুনসান দুপুর। তবে রোদ্দুরের তেজ কমেছে। কোথায় একটা কাঠঠোকরা শব্দ করছে টক্ টক্......।

প্রসেনজিৎবাবুকে ঘরে দেখলাম না। সম্ভবতঃ অফিসের কাজে বেরিয়েছেন।

কিন্তু এসময় মেঘনাদ আমার ঘুম ভাঙালো কেন?

মেঘনাদকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই মেঘনাদ ফিসফিসে স্বরে বললো, একটা ম্যাজিক দেখবি অর্ণব?

মেঘনাদের ম্যাজিক

আমি অবাক হয়ে বললাম, ম্যাজিক! কে দেখাবে?

মেঘনাদের রহস্যভরা কৌতুকে বললো, কৌতূহল হচ্ছে তো? তবে আয় আমার সংগে।

মেঘনাদ পিছু পিছু ঘর ছেড়ে বেরুলাম।

সামনেই প্রশস্ত ডাইনিং স্পেস। দুপাশে দুটো ঘর। ডানদিকের ঘরটা একরকম গুদাম ঘর বলা চলে। পুরনো আমলের নানা ভাঙা বাতিল জিনিসপত্তর ঠাসা রয়েছে। এই ঘরে ঢুকেই নাকি দিনকয়েক আগে রাত্তিরবেলা ডেনিস সাহেবের ভূত অদৃশ্য হয়েছিল- প্রসেনজিৎবাবু গল্প করেছিলেন।

মেঘনাদের সংগে ঘরের মধ্যে পা দিতেই একটা পচা গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল। মেঘনাদ নাক কুঁচকে বললো, ইঃ, গন্ধটা যেন পচা মাংসের মনে হচ্ছে।

পচা মাংস! হ্যাঁ, সেই রকমই বটে! লাশকাটা ঘরে ঢুকলেও এমনি উৎকট গন্ধই নাকে এসে লাগে!

গন্ধের উৎসটা কোথায়?

এদিক ওদিক ভাল করে তাকাতেই চোখ পড়লো। সংগে সংগে গুলিয়ে উঠলো শরীরের ভেতরটা।

ঘরের এক কোণে একটা পচা মড়া পড়ে রয়েছে।

একটা মরা বেড়াল। রঙটা কুচকুচে কালো।

কোনো সময় ঘরে ঢুকে মরে পড়ে রয়েছে কেউ জানে না।

ছবির অংশটা পাল্লার মতো ভেতর দিকে সরে গে

কেই বা জানবে ? এঘরে নিত্য যাতায়াত যার আছে বলে জানা গেছে সে তো আর মানুষ নয়। সে তো এক দুষ্ট প্রেতাত্মা। এ গন্ধ তার খারাপ লাগার কথা নয়।

কালো বেড়ালও নাকি অশুভ প্রতীক। ভাবতেই বুকের ভেতরটা আর একবার দুলে উঠলো।

মেঘনাদকে বললাম, এর মধ্যে তোর ম্যাজিক কিসের মেঘনাদ ?

মেঘনাদ বললো, ধৈর্য ধর বন্ধু, আমার ম্যাজিক এখুনি শুরু হবে।

বলেই ও সামনের দিকে দেয়ালের কাছে এগিয়ে যায়।

সেখানে প্রমাণ সাইজের বিরাট এক তৈলচিত্র। মেঝে থেকে মাত্র এক ফুট ওপরে দেয়ালের সঙ্গে লাগান। বহুদিনের জমা ধুলো ময়লায় ছবিটা এখন আর স্পষ্ট নয়, তবু এটুকু বোঝা যায় চিত্রটি একজন সাহেবের।

মেঘনাদ তৈলচিত্রটার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, কিছু বুঝতে পারছিস ?

আমি বললাম, তুই কী বোঝাতে চাইছিস সেটাই তো এখনও বুঝলাম না।

মেঘনাদ বললো, ওই তৈলচিত্রটার মধ্যে কোনো রহস্য আছে মনে হচ্ছে ?

আমি বললাম, রহস্য না থাক, প্রচণ্ড ধুলো আছে

কিন্তু ধুলো ছবির সব জায়গায় সমান ভাবে লাগে

বলতে বলতে মেঘনাদ ছবির নিচে এক জায়গায় এ টান দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অবাক কাণ্ড !

ফ্রেমের ভেতরে ছবির অংশটা পাল্লার মতো দিকে সরে গেল।

ছবির পেছনে একটা সুড়ঙ্গ পথ।

ভেতরটা অন্ধকার।

আমি ফ্যালফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে আছি মেঘনাদ বললো, সে রাতে সাহেব ভূতের এঘরে অ হয়ে যাওয়ার রহস্যটা আশা করি এবার পরিষ্কার হ অর্ণব ? আসলে ভূত ওই সুড়ঙ্গ পথে পালিয়েছিল

আমি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললাম, ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে যাওয়া যায় ?

মেঘনাদ মুচকি হেসে বললো, সেটা দেখাতে পার আমার এ ম্যাজিক শেষ হবে। আমি সুড়ঙ্গে ঢুকা যতক্ষণ না কোনো সংকেত জানাই তুই এখান থে

ড়বি না, বুঝলি ?

আমি ঢোঁক গিলে ঘাড় নাড়লাম।

মেঘনাদ ঢুকে গেল ছবির ফ্রেম সরিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে।

ও ঢুকতেই ছবির কপাট আবার সামনে এগিয়ে এসে স্বাভাবিক তৈলচিত্রের রূপ ধারণ করলো। এ যেন অনেকটা অফিস বা সিনেমার সুইংডোরের মতো।

কতক্ষণ ওই তৈলচিত্রটার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বলতে পারবো না। মিনিট পনের তো হবেই, এর মধ্যে তৈলচিত্রের আর কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। শতবর্ষ পূর্বের ডেনিস সাহেবও যেন তৈলচিত্রের মধ্যে স্হির অচঞ্চল ভাবে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

প্রথম বিস্ময়ের ঘোরটা এবার একটু একটু করে কাটতে শুরু করেছে, সংগে সংগে নানা রকম চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করছে।

এখনও পর্যন্ত যেটুকু মনে হচ্ছে তাতে বলা যায় সাহেব বাংলোর ভূত রহস্যের পেছনে আর একটা কোনো রহস্য রয়েছে। কিন্তু কে বা কারা সেই রহস্যের মেঘনাদ ? তাদের উদ্দেশ্যটাই বা কী ?

হঠাৎ কাঁধে একটা হাত পড়লো।

চমকে পিছু ফিরলাম।

মেঘনাদ ওর ডান হাতটা বুকের মাঝে আড়াআড়ি তুলে জাদুকরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে বললো, হিয়ার আ'অ্যাম স্যার।

সত্যিই অদ্ভুত ম্যাজিক।

মেঘনাদ তো কই তৈলচিত্রের পেছনের সুড়ঙ্গ থেকে বেরুলো না। তাহলে এখানে এল কি করে ?

মেঘনাদ যা শোনালো তা আরও বিস্ময়কর।

বিশাল তৈলচিত্রের পেছনের সুড়ঙ্গ পথ নেমে গেছে বাংলোর নিচে। সুড়ঙ্গের আর একটা মুখ আছে বাংলোর বাগানে সেই কুয়োর ভেতরের গায়ে, যে কুয়োটার মধ্যেই দেড়শো বছর পূর্বে ডেনিস সাহেবকে গাঁয়ের অত্যাচারিত লোকেরা ফেলে হত্যা করে বলে জনশ্রুতি এবং রাতের অন্ধকারে সেখান থেকেই সাহেব ভূত বেরিয়ে আসে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে।

ভাবতে গিয়ে সব কিছু আরও যেন গোলমাল হয়ে যেতে থাকে।

মেঘনাদ বললো, চল, আমরা ঘরে বসে কথা বলি।

কিন্তু ঘরটা থেকে বেরুবার জন্যে ভেজান ভাঙা দরজাটা ঠেলা দিতেই সেটা হুড়মুড় করে কার গায়ের ওপর যেন পড়ে গেল। উঃ ! বলে একটা অস্ফুষ্ট আর্তনাদ শুনলাম।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখি–পশুপতি ভট্টাচার্য। ভদ্রলোক তখন নিজের নাকে হাত বুলোচ্ছেন।

মেঘনাদ বললো, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন পশুপতিবাবু ?

পশুপতিবাবু আমতা আমতা করে বললেন, অনেকক্ষণ আপনারা ঘরে নেই দেখে খোঁজ করতে এসে......

কোনো দরকার ছিল কি ?

না, দরকার, মানে তেমন কিছু নয়, পশুপতিবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, সন্ধ্যের পর তো এ বাংলোয় মজুমদার সাহেব ছাড়া আমরা কেউ থাকি না, সাহেব বলে গেছেন যাবার আগে আপনাদের চা বানিয়ে যেন ফ্লাস্কে রেখে যাই। তাই জিগ্যেস করতে এসেছিলাম, চা বানাবো, না কফি ?

উত্তরে মেঘনাদ যেন কিছুটা ব্যংগভরেই বললো, আপনার অতিথিপরায়ণতা প্রশংসনীয় পশুপতিবাবু, কিন্তু আপনাকে আর দেরি করাব না। প্রকৃতিতে একটু বাদেই সন্ধ্যার ঘোর নামবে তারপর সাহেব ভূতেরও ঘুম ভাঙবার সময় হবে। আপনি বরং চায়ের সরঞ্জামগুলো ওঘরে রাখার ব্যবস্হা করে চলে যান। সময়মতো চা আমরা নিজেরাই বানিয়ে নেব।

একটু যেন ইতস্তত করেই পশুপতি ভট্টাচার্য চলে গেলেন।

এরপর মেঘনাদ আর আমিও ঘরে ফিরে এলাম।

ঘরে ফিরে জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটু বাদেই প্রসেনজিৎবাবু বাংলোয় ফিরলেন।

সাহেব বাংলোয় তখন আমি আর মেঘনাদ ছাড়া আর কেউ নেই।

নিজেরা চাটা বানিয়ে পান করে তিনজনে বাংলোর বারান্দাটার সামনে এসে বসলাম।

মেঘনাদের মুখে দুপুরের সেই আশ্চর্য ম্যাজিকের কথাটা শুনে প্রসেনজিৎবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এখন তো পরিষ্কার বোঝাই যাচ্ছে এই বাংলোয় ভূত-টুত বলে কিছু নেই। আসলে কোনো এক বদচক্র কোনো এক উদ্দেশ্যে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে। তারাই বাংলোটার ভৌতিক অপবাদ ছড়িয়ে অন্য কাউকে এখান থেকে দূরে রাখতে চায়। ঘরের সংগে বাগানের কুয়োর গোপন সুড়ঙ্গ পথটাও তাদেরই তৈরি।

সেটা তা নাও হতে পারে। মেঘনাদ বললো, আগেকার দিনে জমিদার বাড়ি বা পুরনো নীলকুঠিতে কোথাও

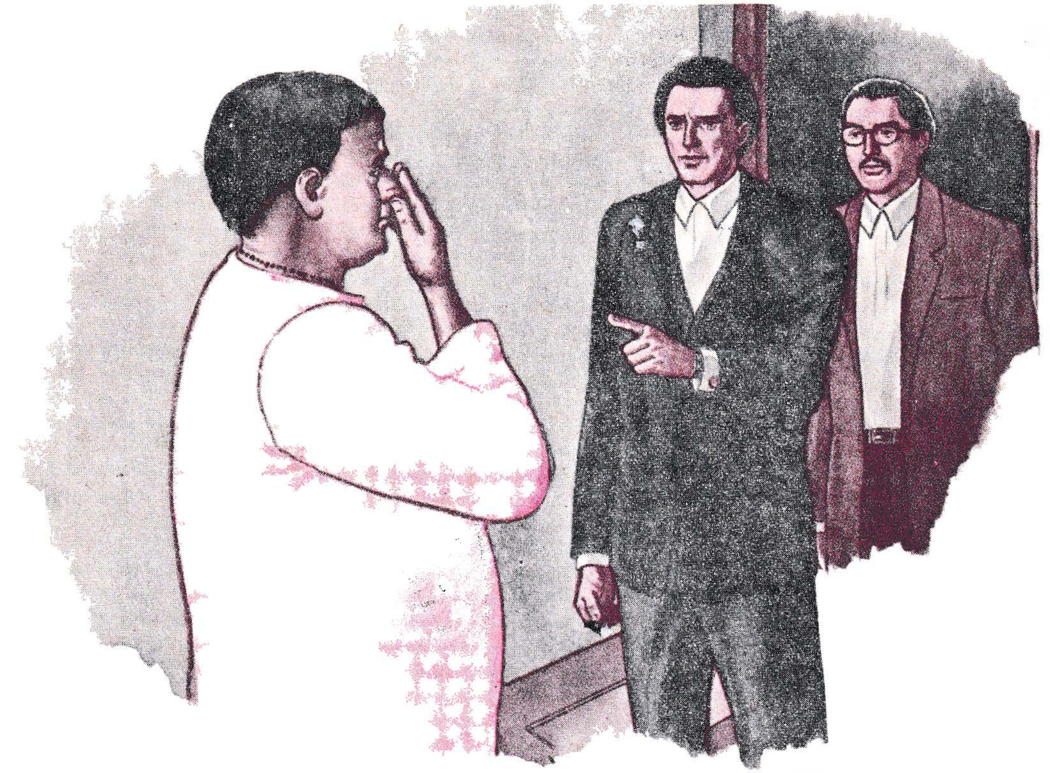

আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন

কোথাও এমন গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ থাকতো, এটাও তেমন কিছু হতে পারে।

এই সুড়ঙ্গ পথের সঙ্গে কি মাটির নিচে কোন গুপ্তঘর তোর চোখে পড়েছে? এবার আমি প্রশ্ন করি।

সত্যি বলতে কি সবটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করার মতো সময় তখন আমার ছিল না। কিন্তু যে কথা বলছিলাম, মেঘনাদ প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলে, সুড়ঙ্গটা প্রাচীন হলেও এটা যে নিয়মিত ব্যবহার হয় তেমন প্রমাণ আমি পেয়েছি।

কী প্রমাণ? প্রসেনজিৎবাবু ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়েন।

এটা সুড়ঙ্গের মধ্যে এক জায়গায় পড়ে ছিল। বলতে বলতে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো মেঘনাদ প্রসেনজিৎবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

ডেনিস সাহেবের ভূত যে বিলক্ষণ ধূমপায়ী সে প্রমাণ পাওয়া গেল।

সে রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বিছানায় যাবার আগে প্রসেনজিৎবাবু বললেন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি তোদের। লোকাল থানার অফিসার-ইন-চার্জ তিনকড়ি পোদ্দারের সঙ্গে আজ বিকালে দেখা হয়েছিল। উনি কী একটা কাজ সেরে ফিরছিলেন। ভদ্রলোক তোদের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন।

আমাদের প্রকৃত পরিচয়টা দিস নি তো? মেঘনাদ বললো।

না, তোর যখন আপত্তি--

বেশ, তা কী বললেন ইনসপেকটর পোদ্দার?

কাল সকালেই যেন থানায় গিয়ে তোরা দুজন ওঁর সঙ্গে দেখা করিস।

মেঘনাদ হাই তুলে বললো, সে দেখা যাবে। এখন তো নিদ্রাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর নাক ডাকতে শুরু করলো।

কিন্তু পরদিন আমাদের আর থানায় গিয়ে ইনসপেকটার পোদ্দারের সঙ্গে দেখা করার দরকার হলো না।

তার আগেই সে রাতে ঘটে গেল এক মারাত্মক দুর্ঘটনা!

এই মুহূর্তে যা আমাদের সব কল্পনার বাইরে ছিল।

[চলবে]

চিত্র : নারায়ণ দেবনাথ

বাংলা ভাষাতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ছবি ও মানচিত্রের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষার অপূর্ব বই।

আদিম যুগের ভারতের মানচিত্র তারপর তার পরিবর্তন, আর্য যুগ, মহাভারত, অশোক থেকে বর্তমান পর্যন্ত ছবির সাহায্যে দেখান আছে।

এতে আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্তম্ভ মন্দির ও পুরাকীর্তির সব প্রামান্য ছবি।

চার রঙের অফসেটে ছাপা ৯৪ পৃষ্ঠার বিরাট এই অসাধারন বই

ষোল টাকা পাঠালে রেজিষ্টারী করে বই পাঠান হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

কলিকাতা - ৯
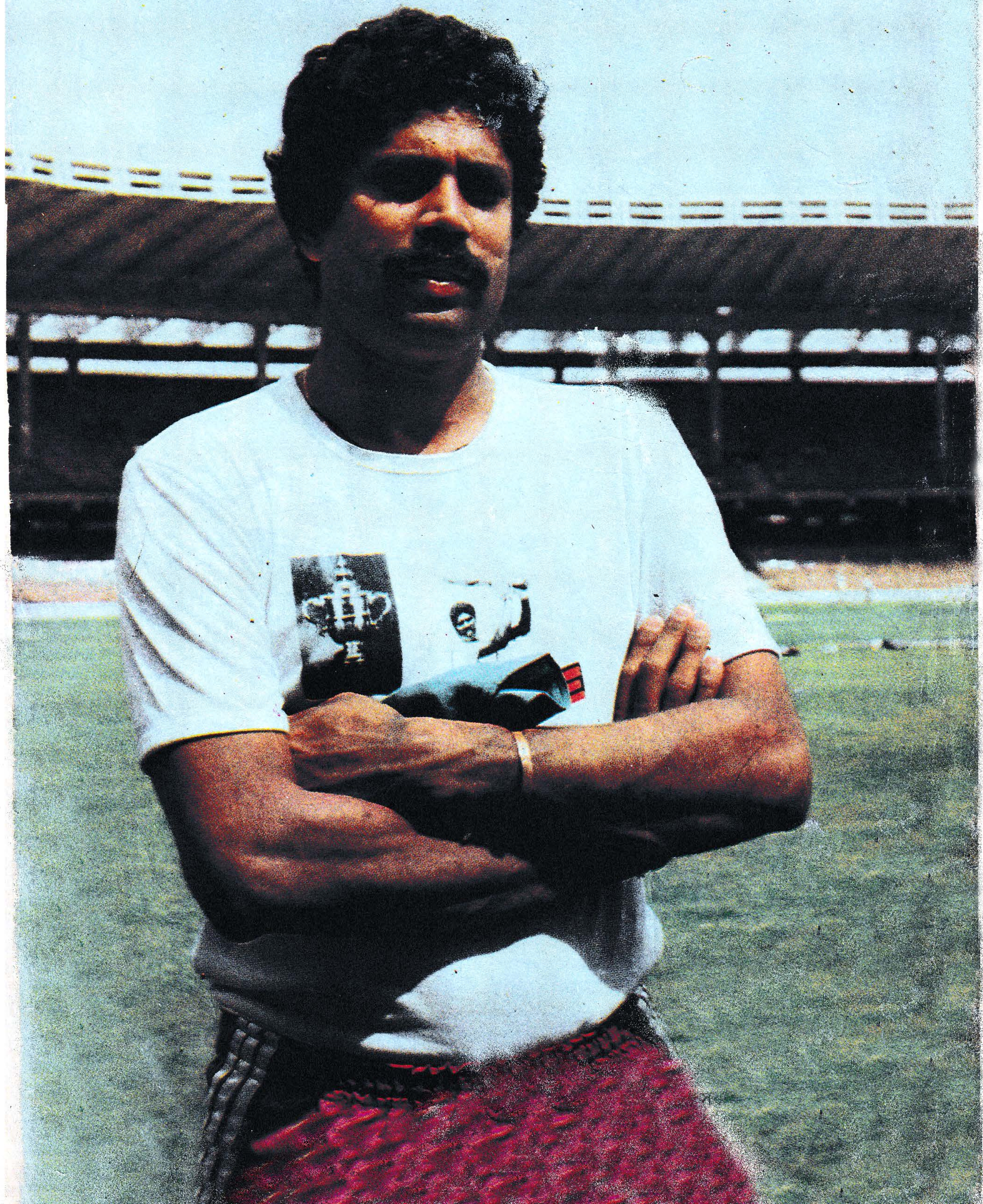
Registration No. W.B./E.C.–60   May '85   "Suktara"